শ্রীরমণ গীতিকা

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণ ভারত

শ্রীরমণ গীতিকা
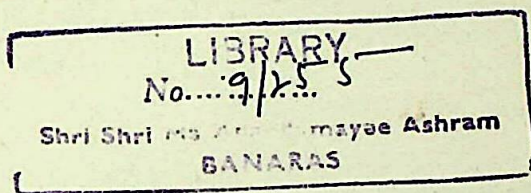
শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণ ভারত

প্রকাশক :

শ্রী টি. এন. ভেকটরমণ
সভাপতি
শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভান্নামালাই
মাদ্রাজ

মুদ্রণ :

শ্রীমুরারিমোহন কুমার
শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৮০, আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-১৪

গ্রন্থণ :

শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

মূল্য : এক টাকা পঁচিশ নঃ পঃ
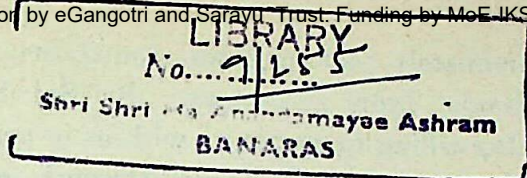
PUBLISHER'S NOTE

"Sri Ramana Geetika" enters the Bengali world twelve years after the Brahma Nirvana of Bhagavan Sri Ramana Maharshi, the great **Jeevanmuktha** and **Jnani.** It is common knowledge that the peoples of the world were drawn to Bhagavan Sri Ramana at His Asramam at Arunachalam (Tiruvannamalai) for over half a century, where they had the Blessings of the **Mouna Vyakhya of Parabrahma Tatwa.** Numerous were the Bengalis who were the recipients of His Grace. Sri Ramanasramam had published books in several Indian and Continental languages, but the books in Bengali were too few.

Bengali devotees of Bhagavan visiting Sri Ramanasramam have been representing the need for a sufficiently comprehensive book of Bhagavan's teachings in Bengali and "Sri Ramana Geetika" was planned in the beginning of 1962. It contains a life-sketch of Bhagavan Sri Ramana Maharshi and three of His very popular works (i) **"Who am I?"** (ii) **"Self Enquiry"** and (iii) **"Upadesa Sara."**

Fortunately for us, we found Sri P. S. Varadaraja Iyer, Secretary, Sri Sai Samaj Calcutta, willing to cooperate with us in printing the Bengali work. He has toiled through several months in arranging for the printing of the book. He had secured in this undertaking the cooperation of Sarvashri Justice P.B. Mukherjee, T.S. Seethapathi, and a host of Ramana devotees, and Sri S. C. Majumdar, Development Officer, Central Bank of India Ltd., Calcutta.

Sri S. C. Majumdar, an ardent Ramana devotee, negotiated with Satabdi Press Private Ltd., went through the proof-pulls, and donated a cash amount.

Smt. Gita Mukherjee, the wife of Justice P.B. Mukherjee, secured donations of a quantity of paper for printing. Sri S. C. Majumdar had rewritten, in cooperation with Justice Mr. P.B. Mukherjee, a part of the original preface and selected the appropriate title to this work.

To these and other unostentatious devotees our thanks are due for having made this Bengali publication possible. Our thanks are no less due to Sri Nripen Sanyal, Clarion Advertising Services Private Ltd., Calcutta, for translating the biography of Bhagavan and the publication

entitled "Self Realisation", and Satabdi Press Private Ltd., 80, Acharya Jagadish Bose Road, Calcutta, for their willing cooperation and neat execution of the publication.

May this publication of "Sri Ramana Geetika" be the forerunner for the appearance of more literature in Bengali language on Atma Vidya as taught by Bhagavan Sri Ramana Maharshi.

SRI RAMANASRAMAM
TIRUVANNAMALAI.
30th November, 1962

T. N. VENKATARAMAN
MANAGER—PRESIDENT

শ্রীরমণ গীতিকা

গ্রন্থ সূচিকা

ভগবান্‌ শ্রীরমণ

টি. এম. পি মহাদেবম্‌—এমএ. পি. এইচ্‌. ডি.
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক প্রণীত

১৯৫৯
শ্রীরমণ আশ্রম
তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণ-ভারত।

সূচনা

এই পুস্তিকার রচনাটি প্রথমে 'দি সেইণ্ট' (The Saint) নামক পুস্তিকার জন্য লেখা হয় এবং উহা "শ্রীরমণ মহর্ষির দর্শন ও অস্তিত্ব" এই আখ্যার বই-এর সাধারণ ভূমিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বসাধারণ পাঠকবর্গের প্রয়োজন বোধে এ রচনাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হইল।

শ্রীভগবানে অর্পিত এ পুস্তিকাগুলিকে তিনি গ্রহণ করুন এই প্রার্থনা।

অরন্ধন দিবস
মে, ৫-১৯৫৯।

টি, এম্, পি, মহাদেবম্।

প্রার্থনা

বিনায়ক প্রশস্তি (স্বস্তিবচন)

হে বিনায়ক, তুমি (মেরু পর্ব্বতের উপত্যকায়) মহর্ষি ব্যাসের বাণী অনুলিখন করেছিলে, অরুণাচল তোমার পীঠস্থান। পূর্ণজন্মের কারণরূপ মায়াশক্তি তুমি বিলুপ্ত কর এবং উপনিষদের সেই মহান সত্য যা আত্মার রসসিক্ত তাকে তুমি কৃপাপরবশ হইয়া রক্ষা কর।

এই শ্লোকটি সকল বিঘ্ন অপসরণকারী গণেশ দেবতার উদ্দ্যেশে ভগবান শ্রীমহর্ষি রমণ কর্তৃক লিখিত একটি প্রার্থনা। গণেশ সব বিঘ্নের অপসারণকারী দেবতা। পুরাণে কথিত আছে যে ব্যাস যখন মহাভারত রচনা করেন তখন গণেশ তাঁর লেখকের কাজ করেছিলেন। এখানে সেই কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং বেদান্ত দর্শনের রক্ষার জন্য গণেশের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে।

ওপরে মুদ্রিত শ্লোকটি ভগবান রমণের হস্তাক্ষরের লিখিত প্রতিলিপি।
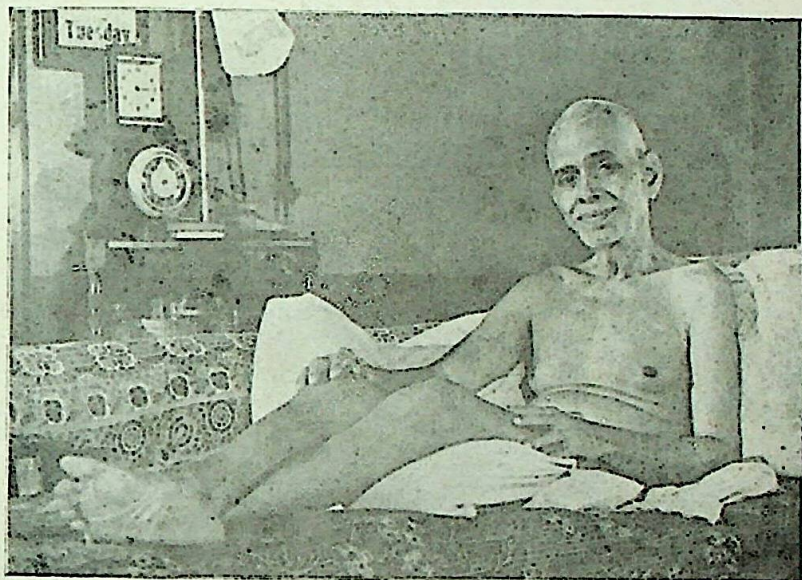
ভগবান্ শ্রীরমণ মহর্ষি

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষি

সংক্ষিপ্ত জীবনী

শ্রীরমণ আশ্রম
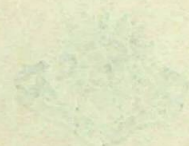
ভগবান্ শ্রীরমণ

শাস্ত্রকাররা বলেছেন, উড়ন্ত পাখীর গতিপথকে রেখাঙ্কিত করা যেমন দুঃসাধ্য, ঋষিদের যাত্রাপথ নিরূপন করাও তেমনি দুরূহ। অধিকাংশ মানুষকেই মন্থর এবং পরিশ্রমসাধ্য যাত্রার মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে পেঁছুতে হয়। কিন্তু কেহ কেহ জন্মগত দক্ষতার বলেই অতি সহজে, সর্ব্বলোকাশ্রয় সেই পরমাত্মাতে একবারও না থেমে পৌঁছাতে পারেন। এধরণের কোন ঋষি যখন আবির্ভূত হন তখন সাধারণ মানুষ বুকে বল পায়। তাঁর উপস্থিতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়, উন্নত হয়, এবং সেই আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে যার সবল তুলনায় জাগতিক ভোগের আনন্দ ম্লান অর্থহীন; যদিও তারা তাঁর সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে চলতে পারে না। অসংখ্য মানুষ মহর্ষি রমণের জীবৎকালে তিরুভন্নামালাই গিয়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। শ্রীরমণের মধ্যে তারা দেখেছে সম্পূর্ণ জাগতিক বাসনাহীন এক ঋষিকে যার পুতচরিত্রের তুলনা বিরল এবং যাঁর মধ্যে বেদান্তের শাশ্বত সত্য প্রকাশিত। তাঁর মত ঋষি পৃথিবীতে খুব কমই আসেন। যখন আসেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ লাভবান হয় এবং নতুন এক আশার যুগ উন্মোচিত হয়।

মাদুরাই থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দক্ষিণে তিরুচুলি নামে গ্রাম। সে গ্রামে একটি অতি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। সুন্দরমূর্তি এবং মানিক্যবাচকর নামে দুই সন্ত এ মন্দির সম্বন্ধে গান রচনা করেছিলেন। সেই পুণ্যগ্রামে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সুন্দরম আয়ার নামে একজন উকিল এবং তাঁর স্ত্রী অলগমাল বাস করতেন। এই আদর্শ দম্পতির চরিত্রের বৈশিষ্ঠ্য ছিল ভক্তি ও

দয়াদাক্ষিণ্য। সুন্দরম আয়ার তাঁর সঙ্গতির বাইরে গিয়েও লোককে সাহায্য করতেন। অলগম্মাল ছিলেন আদর্শ হিন্দুপত্নী। তাঁদেরই ঘরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর ভেঙ্কটরমণ জন্মগ্রহণ করলেন যিনি পরে রমন মহর্ষি বলে পৃথিবীতে খ্যাত হয়েছেন। সেদিনটা ছিল আদ্রা-দর্শনম্-এর দিন এবং হিন্দুদের পক্ষে শুভদিন। সে দিন নটরাজ শিবের মূর্তি মন্দির থেকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর নটরাজের মূর্তি শোভাযাত্রা-সহকারে এবং যথোচিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে মন্দির থেকে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনা হল। নটরাজ মন্দিরে প্রবেশ করতে যাবেন সেই সময় ভেঙ্কটরমণ ভূমিষ্ঠ হলেন। ভেঙ্কটরমণের বাল্যকাল এমন কিছু বৈশিষ্ট্যময় নয়। আর দশটা সাধারণ শিশুর মতই তিনি বেড়ে উঠতে লাগলেন। প্রথমে তিরুচুলির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং পরে এক বৎসরের জন্য ডিনডিগুলের একটি স্কুলে তাঁকে পাঠান হল। যখন তাঁর বয়স বারো তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হল। ফলে পরিবারসহ তাঁকে মাদুরাই গিয়ে তাঁর কাকা সুব্বাইয়ার-এর আশ্রয় নিতে হল। সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে 'স্কটস্ মিড্‌ল্ স্কুল' এবং পরে 'এ্যামেরিকান মিশন হাই স্কুলে ভর্তি হলেন। লেখাপড়ায় তাঁর একেবারেই উৎসাহ ছিল না; কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান ছিলেন। তাই তাঁর সহপাঠী এবং অন্যান্য বালকরা তাঁকে ভয় করত। কোন কারণে তাঁর ওপর রাগ থাকলেও একমাত্র ঘুমন্ত অবস্থায় ছাড়া কেউ তাঁকে ঘাঁটাতে সাহস করত না। তাঁর ঘুমটা একটু অস্বাভাবিক ছিল। ঘুমের মধ্যে তাঁকে টেনে নিয়ে গেলেও বা মারলেও তিনি টের পেতেন না, তাঁর ঘুম ভাঙতনা।

ভেঙ্কটরমণের বয়স যখন ষোল তখন তিনি প্রায় আচমকাই অরুণাচলের নাম শুনেছিলেন। তাঁর এক বৃদ্ধ আত্মীয় একদিন তাঁদের

বাড়িতে দেখা করতে এলেন। ভেঙ্কটরমণ জানতে চাইলেন তিনি কোথা থেকে আসছেন; আত্মীয়টি জানালেন, 'অরুণাচলম্ থেকে।' 'অরুণাচল' নামটাই ভেঙ্কটরমণের উপর ম্যাজিকের মত কাজ করল এবং উত্তেজিত হয়ে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'অরুণাচলম্ থেকে? অরুণাচল কোথায়?' উত্তরে তিনি জানলেন যে তিরুভন্নমালাই-ই অরুণাচলম্।

এই ঘটনার উল্লেখ করে অরুণাচলের প্রতি নিবেদিত এক শ্লোকে মহর্ষি বলেছেন, কী মহা বিস্ময়! অচেতন পাহাড়ের মত সে দাঁড়িয়ে আছে যার কাজ বোঝা কারো পক্ষেই সহজ নয়। বাল্যকাল থেকেই আমার মনে হয়েছে অরুণাচলম্ একটা বিরাট কিছু। যখন শুনলাম যে তিরুভন্নমালাই-ই অরুণাচলম্ তখন আমি তার অর্থ বুঝতে পারি নি। পরে যখন আমার মনকে স্থির করে তিনি আমাকে তার কাছে টেনে তুললেন এবং আমি তার নিকটবর্তী হলাম তখন বুঝতে পারলাম যে তিনিই সেই মহাস্থাবর।'

অরুণাচলের ঘটনার পরে আর একটি ঘটনা ঘটল যার ফলে ভেঙ্কটরমণের মন আধ্যাত্মিকতার গভীরতর মূল্যবোধের দিকে আকৃষ্ট হল। হঠাৎ একদিন 'সেক্কিলার' 'পেরিয়পুরানম গ্রন্থখানা তাঁর হাতে এল। 'পেরিয়পুরানম'-এ বর্নিত শৈবসাধকদের জীবনী পড়ে তিনি মুগ্ধ হলেন। এই প্রথম তিনি ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থপাঠ করলেন। সাধকদের জীবন তাঁকে অনুপ্রাণিত করল এবং তাঁর হৃদয়ের গভীরে তা সাড়া জাগাল। পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলেও তাঁর মনে ত্যাগ এবং ভক্তিকে জাগিয়ে তুলবার বাসনা দেখা দিল।

যে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা তিনি একান্তভাবে লাভ করতে চাইছিলেন তা হঠাৎ তাঁর কাছে আবির্ভূত হল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে, তাঁর বয়স যখন সতের, একদিন ভেঙ্কটরমণ কাকার বাড়ির

একতলার মেঝেতে বসেছিলেন। তাঁর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, যেমন সাধারণতঃ থাকত। কিন্তু হঠাৎ ভয়ঙ্কর মৃত্যুভীতি তাঁকে আচ্ছন্ন করল। তাঁর মনে হল, মৃত্যুসময় উপস্থিত। কেন এমন হল তিনি জানতেন না। শান্তমনে তিনি তাঁর কর্তব্য স্থির করলেন। মনে মনে বললেন, 'এখন আমার মৃত্যুসময় উপস্থিত। এর মানে কি? কার মৃত্যু হবে? শরীরটার।' তৎক্ষণাৎ তিনি শুয়ে পড়লেন এবং হাতপা ছড়িয়ে শক্ত হয়ে রইলেন, যেন মৃত্যু সত্যই এসেছে। দম বন্ধ করে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাখলেন যার ফলে বাইরে থেকে তাঁকে সত্যই শব মনে হল। তখন তিনি ভাবলেন, 'এই দেহটা মৃত। একে এখন শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়ে ছাই করা হবে। কিন্তু দেহের মৃত্যুর সঙ্গে কি আমারও মৃত্যু হবে? দেহটাই কি আমি? এই দেহ ত এখন নিশ্চল, নিষ্প্রাণ, কিন্তু আমি ত আমার ভেতরে আত্মার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। সুতরাং আমি সেই আত্মা যে দেহের ঊর্দ্ধে। দেহের মৃত্যু হয়, কিন্তু আত্মা যেহেতু দেহের ঊর্দ্ধে তার মৃত্যু নাই। সুতরাং 'আমি' মৃত্যুহীন আত্মা।' পরে ভগবান রমণ যখন ভক্তদের কাছে এ ঘটনাটি-বিবৃত করেন তখন মনে হতে পারত যে এটা একটি যুক্তির অনুক্রম। কিন্তু তা যে সত্য নয় এবং সমস্ত ব্যাপারটা যে বিদ্যুতের ঝল্‌কানির মত মুহূর্তের মধ্যে ঘটেছে তা তিনি পরিষ্কারভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যকে তিনি সোজাসুজিই অনুভব করেছিলেন যে আত্মা একটি অত্যন্ত বাস্তব পদার্থ এবং একমাত্র বাস্তব পদার্থ। তারপর থেকে তাঁর মৃত্যু ভয় চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে কিশোর ভেঙ্কটরমণ দীর্ঘ এবং শ্রমসাধ্য সাধনা না করেই আধ্যাত্মিকতার চূড়ায় আরোহণ করেছিলেন। আত্মার চেতনা অহংবোধকে বন্যার মতো নিমজ্জিত করেছিল। এবং অকস্মাৎ যে বালক ভেঙ্কটরমণ বলে পরিচিত ছিল সে ঋষিত্ব লাভ করল।

কিশোর ঋষির চরিত্রে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দিল। যে সব জিনিষকে আগে তিনি মূল্যবান বলে মনে করতেন তারা তাঁর কাছে মূল্যহীন বলে বোধ হল এবং যে আধ্যাত্মিকতাকে তিনি অবহেলা করেছিলেন সেই আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহই এখন তাঁর মনোযোগের একমাত্র জিনিষ হয়ে উঠল। স্কুলের পড়া, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন মনে হল। পরিপার্শ্ব সম্বন্ধেও তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে উঠলেন। বিনয়, নম্রতা, নির্বিরোধিতা এবং অন্যান্য সদ্‌গুণ তাঁর চরিত্রকে অলঙ্কৃত করল। তিনি নির্জনে বসে 'আত্মার' চিন্তায় মগ্ন হতেন। 'মীনাক্ষী' মন্দিরে গিয়ে প্রতিদিন দেবতা এবং তাঁর ভক্তদের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং আশ্চর্য আনন্দের অনুভূতিতে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অজস্রধারায় অশ্রুপাত হত। তাঁর নতুন দৃষ্টি সব সময় তাঁর মধ্যে জাগ্রত থাকত। তাঁর জীবন তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত।

ভেঙ্কটরমণের বড় ভাই তাঁর পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন এবং কয়েকবার তাঁর উদাসীনতা এবং যোগীসুলভ ব্যবহারের জন্য তাঁকে তিরস্কারও করলেন। সেই মহান অভিজ্ঞতার প্রায় মাস দেড়েক পরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগাষ্ট ভেঙ্কটরমণের ইংরেজী শিক্ষক 'বেনস্ গ্র্যামার' থেকে তাঁর পাঠ তিনবার কপি করতে বললেন। পড়াশুনার প্রতি তাঁর উপেক্ষার জন্য এটা তাঁর শাস্তি হিসাবে গণ্য হল। তিনি দু'বার কপি করলেন, কিন্তু তারপরেই এর অর্থহীনতা উপলব্ধি করে বই খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হলেন। ভেঙ্কটরমণের দাদা সর্ব্বক্ষণ তাঁকে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'এ ধরণের ছেলের ও সবের সার্থকতা কি আছে?' একথা ভেঙ্কটরমণের জাগতিক বাসনাহীনতা এবং পড়াশুনোর প্রতি উপেক্ষার জন্য স্পষ্টতঃই তিরস্কার। ভেঙ্কটরমণ কিন্তু একথার

কোন উত্তর দিলেন না। নিজের কাছে তিনি স্বীকার করলেন যে পড়াশুনোর অভিনয় করা এবং পূর্বের জীবনে ফিরে যাওয়া অর্থহীন। তিনি স্থির করলেন গৃহত্যাগ করবেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাঁর মনে পড়ল তিরুভন্নমালাইর কথা। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কথা বড়দের জানালে তারা তাঁকে যেতে দেবেন না। সুতরাং তাঁকে ফিকিরের আশ্রয় নিতে হল। তাঁর ভাইকে তিনি বললেন, একটি বিশেষ ক্লাসে যোগদান করবার জন্যে তিনি দুপুরে স্কুলে যাবেন। তাঁর ভাই তখন তাঁকে নিচের বাক্স থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে তাঁর কলেজের মাইনেটা দিয়ে দিতে বললেন। ভেঙ্কটরমণ নিচে গেলেন; তাঁর কাকীমা তাঁকে খাবার দিলেন এবং পাঁচটি টাকা দিলেন। ভেঙ্কটরমণ একখানা ম্যাপ বের করে দেখলেন তিরুভন্ন-মালাইর সব চেয়ে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশনের নাম টিন্‌ডিভালম্। আসলে সেখান থেকে তিরুভন্নমালাই পর্য্যন্ত রেলের একটি শাখালাইন গেছে। ম্যাপটি পুরোনো বলে সেই শাখালাইনটি তাতে অঙ্কিত ছিল না। ভেঙ্কটরমণ হিসেব করে দেখলেন, তিনটাকা নিলেই চলবে। সুতরাং তিনটাকা নিয়ে বাকি দু টাকা এবং একটি চিঠি রেখে তিনি যাত্রা করলেন। টাকা এবং চিঠি এমন জায়গায় রাখলেন যেন সহজেই তাঁর ভাইর নজরে পড়ে। তাঁর চিঠিতে লেখা ছিল, 'আমি আমার পিতা ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী তাঁরই খোঁজে যাত্রা করলাম। এই ব্যক্তি (অর্থাৎ ভেঙ্কটরমণ নিজে) একটি পুণ্য কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছে, সুতরাং দুঃখ করার কোন প্রয়োজন নেই। এই ব্যক্তিকে খুঁজবার জন্যে অর্থব্যয়ও অপ্রয়োজনীয়। আপনার কলেজের মাইনে দেওয়া হয়নি। এখানে দু' টাকা রইল।'

শোনা যায় এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ভেঙ্কটরমণের পূর্বপুরুষদের

কাছে ভিক্ষা না পেয়ে তাঁদের পরিবারকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক পুরুষপরম্পরা সে পরিবারের একজন সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। বস্তুত এই অভিশাপ আশীর্বাদেরই তুল্য হল। সুন্দরন্ আয়ারের এক কাকা এবং পরে তার দাদা সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। এবার ভেঙ্কটরমণের পালা। অবশ্য অভিশাপ যে এ ভাবে কার্যকরী হবে তা কেউ অনুমান করতে পারে নি। ভেঙ্কটরমণের হৃদয়ে নিরাসক্তি স্থান নিল এবং তিনি পরিব্রাজক হয়ে বেরুলেন।

মাদুরাই থেকে তিরুভন্নমালাই পর্যন্ত ভেঙ্কটরমণের এই যাত্রা অনেক মহৎ ঘটনায় পূর্ণ। দুপুরবেলা তিনি তাঁর কাকার বাড়ি ছেড়ে বেরুলেন এবং হেঁটে আধমাইল দূরে রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছলেন। ভাগ্যক্রমে ট্রেন সেদিন দেরীতে আসছিল, নইলে তিনি ট্রেন পেতেন না। ভাড়ার তালিকা খুঁজে দেখলেন টীন্‌ডিভালন্ পর্য্যন্ত ভাড়া দু' টাকা তের আনা। একখানা টিকিট কিনে বাকি তিন আনা নিজের কাছে রাখলেন। যদি তিনি জানতেন যে তিরুভন্ন-মালাই পর্যন্তই ট্রেনে যাওয়া সম্ভব এবং যদি তার ভাড়ার খোঁজ নিতেন তাহলে দেখতেন, ভাড়া ঠিক্ ঠিক্ তিনটাকা। ট্রেন এলে তিনি বেশ শান্তভাবে উঠে বসলেন। সহযাত্রী এক মৌলভীর সঙ্গে আলাপ হল এবং তার কাছেই তিনি জানতে পারলেন যে তিরুভন্নমালাই পর্যন্তই ট্রেনে যাওয়া সম্ভব এবং ভিল্লুপুরম-এর ট্রেন পাল্টালেই চলে, টিন্‌ভিভালম-এ যাওয়ার প্রয়োজন নেই। একটু বেশ প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া গেল। সন্ধ্যেবেলা ট্রেন তিরুচিরাপল্লী পৌঁছল। ভেঙ্কটরমণ তখন ক্ষুধার্ত। দু' পয়সা দিয়ে তিনি দুটি পেয়ারা কিনলেন এবং এক কামড় খেতেই আশ্চর্যজনকভাবে তার ক্ষুধা শান্তি হল। ভোর তিনটের সময় ট্রেন ভিল্লুপুরম-এ পৌঁছল। সেখান থেকে তিরুভন্নমালাই অবধি হেঁটে যাবেন স্থির করে ভেঙ্কটরমণ ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন।

ভোর হলে তিনি শহরে গেলেন এবং তিরুভন্নমালাই যাবার পথ-নির্দ্দেশ খুঁজতে লাগলেন। 'মামবলপট্টু' লেখা একটি সাইনবোর্ড তাঁর চোখে পড়ল। তিরুভন্নমালাই যাবার পথে 'মামবলপট্টু' যে একটি জায়গা তা তিনি জানতেন না। তখন তিনি ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। সুতরাং পথ খুঁজবার চেষ্টা ছেড়ে কিছু খেয়ে নিয়ে শ্রান্তি দূর করবার জন্য এক হোটেলে গিয়ে খাবার চাইলেন। খাবার তৈরি হতে দুপুর হয়ে গেল, ততক্ষণ তিনি বসে রইলেন। খাওয়া হলে মূল্য হিসেবে হোটেলের মালিককে দু' আনা দিলেন। মালিক তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে যখন জানলেন যে তাঁর কাছে সব শুদ্ধ দু' আনা দু' পয়সা আছে তখন আর তিনি খাবারের দাম নিলেন না। ভেঙ্কট-রমণ তার কাছেই শুনলেন যে মামবলপট্টু তিরুভন্নমালাই যাবার পথে একটি জায়গা। ভেঙ্কটরমণ স্টেশনে ফিরে গিয়ে মামবলপট্টু-র একখানা টিকিট কিনলেন। তাঁর কাছে যে পয়সা ছিল তাতে টিকিটের দাম ঠিক ঠিক কুলিয়ে গেল।

ভেঙ্কটরমণ যখন মামবলপট্টু পেঁছিলেন তখন বিকেল হয়েছে। ট্রেন থেকে নেমে তিরুভন্নমালাই-র দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। প্রায় দশ মাইল হেঁটে তিনি আরিয়নিনাল্লুরের মন্দিরে পেঁছিলেন। তখন বেশ রাত হয়েছে। মন্দিরটি একটি বিরাট পাথরের ওপর তৈরি। মন্দিরের দরজা খুললে তার থামওয়ালা হলঘরে গিয়ে বসলেন। সেখানে বসে দিব্যদৃষ্টিতে অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন। সে আলো যেন সমস্ত মন্দির জুড়ে রয়েছে অথচ তার কোন বাস্তব দেহ নেই। কিছুক্ষণ পরে আলো অন্তর্হিত হল; কিন্তু ভেঙ্কটরমণ গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইলেন। এদিকে মন্দিরের পুরোহিতরা দরজা বন্ধ করে তিন পোয়া মাইল দূরে কিলুরে আর এক মন্দিরে পূজো করতে যাবেন। সুতরাং তাঁরা এসে ভেঙ্কটরমণকে

জাগালেন। ভেঙ্কটরমণ ও তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন এবং সে মন্দিরে গিয়ে তিনি আবার সমাধি মগ্ন হয়ে পড়লেন। পুজো শেষ হলে পুরোহিতরা তাঁকে জাগালেন, কিন্তু তাঁকে কোন খাবার দিতে রাজী হলেন না। মন্দিরের ঢোলবাদক ভেঙ্কটরমণের সঙ্গে এই রূঢ় ব্যবহার লক্ষ্য করে তার ভাগের খাবার এই অদ্ভুত দর্শন যুবককে দিতে পুরোহিতদের অনুরোধ করল। ভেঙ্কটরমণ জল চাইলেন এবং তাঁকে একটু দূরে জনৈক শাস্ত্রীর বাড়ি দেখিয়ে দেওয়া হল। সেখানে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন একদল কৌতুহলী লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জল এবং খাবার খেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন ৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৬ কৃষ্ণের জন্মতিথি 'গোকুলাস্টমী'। ভেঙ্কটরমণ আবার হাঁটতে শুরু করলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত বোধ করলেন। তিনি তখন খাবারের কথা ভাবতে লাগলেন এবং খেয়ে নিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে ট্রেনে তিরুভন্নমালাই যাবেন স্থির করলেন। তাঁর মনে হল, কানের সোনার মাকড়ি দুটো বিক্রি করে দিলে মন্দ হয় না। কিন্তু কি করে করবেন? ভাবতে ভাবতে একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং বাড়ির মালিক মুথুকৃষ্ণ ভগবতার কাছে খাবার চাইলেন। ভগবতার তাঁকে বাড়ির গৃহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গৃহিনী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দিনে খুশি হয়ে তরুণ সন্ন্যাসীকে খাবার দিলেন। খাওয়ার পরে ভেঙ্কটরমণ ভগবতারের কাছে গিয়ে সোনার মাকড়ি দুটো বাধা রেখে তিরুভন্ন-মালাই যাবার খরচ হিসেবে চারিটি টাকা চাইলেন। মাকড়ির আসল দাম প্রায় কুড়ি টাকা। কিন্তু অত টাকা তাঁর প্রয়োজন ছিল না। ভগবতার মাকড়ি দুটো পরীক্ষা করে তাঁকে চারটি টাকা দিলেন, তাঁর নাম ঠিকানা লিখে নিলেন এবং নিজের নাম ঠিকানা

তাঁকে দিলেন। বললেন, যে কোন দিন এসে সে তাঁর মাকড়ি ছাড়িয়ে নিতে পারবে। ভেঙ্কটরমণ সে বাড়িতে তাঁর দুপুরের খাওয়া খেয়েছিলেন। বাড়ির গৃহিনী 'গোকুলাস্টমী' উপলক্ষ্যে তৈরি কিছু মিঠাইও তাঁকে দিয়ে দিলেন।

তাদের কাছে বিদায় নিয়ে ভেঙ্কটরমণ ষ্টেশনে এলেন এবং ভগবতারের নামঠিকানা লিখা কাগজটা ছিড়ে ফেললেন, কেননা মাকড়ি দুটো ছাড়িয়ে নেবার কোন বাসনাই তাঁর ছিল না। পরের দিন ভোরে ট্রেন। অতএব রাতটা তিনি ষ্টেশনেই কাটালেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর ভোরে তিনি তিরুভন্নমালাইর ট্রেন ধরলেন এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পেঁীছে গেলেন। ট্রেন থেকে নেমে তিনি সোজা অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরে গেলেন। মন্দিরের সব দরজাই খোলা, এমন কি বিগ্রহের দরজাও। একটা লোক নেই কোথাও, পুরোহিতরা পর্যন্ত নেই। অরুণাচলেশ্বরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর মন ভরে গেল। মহাযাত্রা শেষ হয়েছে এবং তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে নিরাপদে পেঁীছেছেন।

রমণের (এখন থেকে এই নামেই তাঁকে উল্লেখ করব) বাকি জীবন তিরুভন্নমালাই কেটেছে। শ্রীরমণ আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি। মন্দির থেকে বেরিয়ে রাস্তায় হাঁটছেন এমন সময় একজন তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করল তিনি মাথার চুল কামাবেন কিনা। রমণ রাজী হলেন। ক্ষৌরকার তাঁকে আয়ানকুলম নামক পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে তাঁর মাথা কামিয়ে দিলেন। তারপর পুকুরের ঘাটে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট টাকা জলে ফেলে দিলেন। ভগবতারের স্ত্রী তাঁকে যে মিঠাই দিয়েছিলেন তাও ফেলে দিলেন এবং অবশেষে পৈতেটাও ফেলে দিলেন। মন্দিরে ফেরার পথে তিনি ভাবছিলেন, শরীরটাকে স্নানের বিলাস উপভোগ করতে দেবেন কিনা। হঠাৎ বৃষ্টি নেমে তাঁকে স্নান করিয়ে দিল।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ তিনি মন্দিরের হাজার থামওয়ালা হলঘরে থাকলেন। কিন্তু মুশকিল হল ধ্যানে বসলেই রাস্তার ছেলেগুলো ঢিল ছুঁড়তে লাগল। বাধ্য হয়ে তিনি একটি নিভৃত কোনে আশ্রয় নিলেন এবং সেখান থেকে মাটির নিচে 'পাতাল লিঙ্গম' নামক গুহায়। সেখানে দিনের পর দিন তিনি গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। এমন কি কীট-পতঙ্গের কামড়ও তিনি টের পেতেন না। কিন্তু কিছুদিন যেতেই দুষ্ট ছেলেগুলো সেই গুপ্ত গুহা আবিষ্কার করে ফেলল এবং তাঁর গায়ে ভাঙা হাড়িকুঁড়ির টুকরো ছুঁড়তে লাগল। সে সময় তিরুভন্নমালাইতে শেষদ্রী নামে একজন বয়জেষ্ঠ স্বামী ছিলেন। যারা তাঁকে চিনত না তারা ভাবত, লোকটা পাগল। শেষাদ্রী কখনও রমণকে পাহাড়া দিতেন এবং ছেলেদের অত্যাচারের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন। অবশেষে একদিন যখন রমণ ধ্যানস্থ ছিলেন তখন তাঁর ভক্তরা তাঁকে সেই গুহা থেকে উদ্ধার করে সুব্রামণ্যর পূজাবেদীর কাছে এনে বসালেন। রমণ কিন্তু কিছুই টের পেলেন না। তারপর থেকে তাঁর যত্ন নেবার লোকের অভাব হয় নি। তাঁর বাসস্থান থেকে থেকে পরিবর্তন করা হত, কখনও বাগানে, কখনও কুঞ্জে, কখনও পূজাবেদীর কাছে। রমন নিজে কখনও কথা বলতেন না। কথা বলবেন না এমন কোন প্রতিজ্ঞা অবশ্য তাঁর ছিল না, আসলে কথা বলার কোন ইচ্ছেই তাঁর হতো না। কখনও কখনও 'বশিষ্টম,' 'কৈবল্যনবনিত্যম্' ইত্যাদি বই থেকে তাঁকে পড়ে শোনান হত।

তিরুভন্নমালাইতে ছয়মাস পূর্ণ হবার কয়েক দিন আগে রমণ 'গুরুমূর্তম্' মন্দিরের রক্ষক তম্বিরানস্বামীর অনুরোধে সেখানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। যত দিন যেতে লাগল এবং রমণের খ্যাতি ছড়াতে লাগল তত তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী ভক্ত এবং পরিব্রাজকের সংখ্যা বাড়তে লাগল। রমণ সেখানে 'ব্রাহ্মণ স্বামী' বলে খ্যাত হলেন এবং এক

বছর সে মন্দিরে থেকে নিকটবর্তী একটি আম্রকুঞ্জে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তাঁর এক কাকা নেলীয়াপ্পা আয়ার এখানে এসে তাঁকে খুঁজে বের করলেন। নেলীয়াপ্পা আয়ার মানামাদুরাইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল ছিলেন। ভেঙ্কটরমণ একজন শ্রদ্ধাভাজন সাধু হয়েছেন এই খবর এক বন্ধুর কাছে শুনে তিনি তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁর ইচ্ছা রমণের সঙ্গে করে মানামাদুরাই নিয়ে যান। কিন্তু রমণ রাজী হলেন না। নেলীয়াপ্পা আয়ারের প্রতি তিনি কোন উৎসুক্যই প্রকাশ করলেন না। সুতরাং তিনি ভগ্নমনোরথ হয়ে মানামাদুরাই-তে ফিরে গেলেন। অবশ্য, খবরটা তিনি রমেণের মাতাকে পৌঁছে দিলেন।

রমণের মাতা বড় ছেলেকে নিয়ে তিরুভন্নমালাই এলেন। রমণ তখন পবলক্কুলরু-তে বাস করছেন। মাতা অলগমাল রমণকে তাঁর সঙ্গে ফিরে যাবার জন্যে অশ্রুপূর্ণ নয়নে কাতর অনুরোধ করলেন। কিন্তু ঋষি রমণের পক্ষে তা অসম্ভব। মাতার কান্নাকাটি, বিলাপ—কোন কিছুই তাঁকে বিচলিত করতে পারল না। তিনি নির্বাক হয়ে থাকলেন, একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। একজন ভক্ত মাতা এবং পুত্রের এই সংগ্রাম লক্ষ্য করছিলেন। তিনি অবশেষে রমণকে তাঁর বক্তব্য লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। অত্যন্ত নৈবক্তিকভাবে রমণ একটুকরো কাগজে লিখলেন :

'ভগবান প্রত্যেককে তার প্রারব্ধ অনুযায়ী কাজ করান। যা হবার নয় তা হাজার চেষ্টা করলেও হবে না। যা হবার তা হবেই, মানুষ তাকে বন্ধ করার যত চেষ্টাই করুক না কেন। একথা নিশ্চিত সত্য। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি চুপ করে থাকবেন।'

নিরাশ হয়ে এবং ভগ্নহৃদয় নিয়ে মাতা অলগমাল মানামাদুরাই ফিরে গেলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে রমণ অরুণাচল পর্বতের 'বীরুপাক্ষ' নামক গুহায় গিয়ে বাস করতে লাগলেন। বীরুপাক্ষ

নামে এক মুনি এককালে সেই গুহায় বাস করতেন এবং মৃত্যুর পর সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। সেই থেকে গুহাটির নাম হল বীরূপাক্ষ। সেই গুহায় ও জনতা ভীড় করে এল। তার মধ্যে কয়েকটি খাঁটি জিজ্ঞাসুমনা ব্যক্তিও এলেন তারা রমণকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতেন অথবা শাস্ত্রগ্রন্থ এনে কোন কোন বিষয় ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করতেন শ্রীরমণ কখনও কখনও এ সবের উত্তর লিখে দিতেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' ও এসেছিল এবং শ্রীরমণ তার তামিল অনুবাদও করিছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ সরল অশিক্ষিত লোক ও তাঁর কাছে মাঝে মাঝে শান্তি ও আধ্যাত্মিক লাভের আশায় আসতো যেমন একমল। একমল তার স্বামী পুত্র কন্যা হারিয়ে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েছিল। অবশেষে ভাগ্য তাকে রমণের কাছে নিয়ে এল। সে প্রতিদিন এসে স্বামীজীকে দর্শন করত এবং স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গে যে সব ভক্তগণ বাস করত তাঁদের সকলের জন্য খাবার নিয়ে আসত। এই পবিত্র কর্তব্য সে নিজে থেকেই গ্রহণ করেছিল।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি শাস্ত্রী নামে একজন বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত এবং সন্ত তিরুভন্নমালাইতে এলেন। ধর্মের নিয়মকানুন অত্যন্ত কঠোরভাবে পালন করতেন বলে তিনি গণপতি মুণি বলেও খ্যাত ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'কাব্যকণ্ঠ' এবং শিষ্যরা তাঁকে পিতা বলে সম্বোধন করত। তিনি ভগবতীমাতৃপূজায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বীরূপাক্ষ গুহায় এসে তিনি বেশ কয়েকবার রমণের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিল। রমণ যে পর্বতে বাস করতেন তিনি সেখানে গেলেন। শ্রীরমণ তখন তাঁর গুহায় একা বসে ছিলেন। গণপতি মুণি বললেন, 'যে সব গ্রন্থ পড়া প্রয়োজন তা আমি পড়েছি। এমন কি 'বেদান্ত

শাস্ত্র'-ও আমি পুরোপুরি বুঝেছি। আমি প্রচুর যপও করেছি, কিন্তু তবু আজ অবধি বুঝতে পারিনি 'তপস' কাকে বলে। তাই আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে 'তপস'-এর প্রকৃতি বুঝিয়ে দিন।' রমণ এবার কথা বললেন; বললেন, কেউ যদি লক্ষ্য করে 'আমি'-র ধারণা কোথা থেকে আসছে তা হলে তার মন সেখানে নিমজ্জিত হয়; এবং তা-ই হচ্ছে 'তপস'। যখন মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তখন কেউ যদি লক্ষ্য করে কোথা থেকে মন্ত্রের ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে তা হলে তার মন সেখানে নিমজ্জিত হয়; এবং তা-ই হচ্চে 'তপস'।' মহাপণ্ডিত গণপতির কাছে তখন সব অর্থ চকিতে উদ্ভাসিত হল; তিনি অনুভব করলেন ঋষি রমণের কৃপা তাঁকে ঘিরে আছে। তিনিই রমণকে মহর্ষি এবং ভগবান বলে ঘোষণা করলেন এবং তাঁকে প্রশংসা করে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করলেন। রমণের উপদেশাবলী ব্যাখ্যা করে তিনি 'রমণ-গীতা' রচনা করেছিলেন।

শ্রীরমণের মাতা মানামাদুরাই ফিরে এসে তাঁর বড় ছেলেকে হারালেন। দু'বছর পরে তাঁর ছোট ছেলে নাগসুন্দরম্ তিরুভন্নমালাইতে অল্পসময়ের জন্য একবার গিয়েছিলেন। তিনি নিজেও দু'বার গিয়েছিলেন। একবার বারাণসী থেকে তীর্থ করে ফেরার পথে, অন্যবার তিরুপতি-দর্শন ফেরৎ। শেষবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং টাইফয়েড-এর লক্ষণ দেখা দিল। রমণ তাঁকে খুব সেবাযত্ন করলেন, এমন কি মাতার রোগমুক্তি কামনা করে প্রভু অরুণাচলের উদ্দেশ্যে তামিল ভাষায় একটি স্তোত্রও রচনা করলেন। এই স্তোত্রের আরম্ভ এই রকম: 'হে পর্ব্বতরূপী ঔষধিঈশ্বর, আমার মাতা তোমার শ্রীচরণকে তাঁর একমাত্র আশ্রয় বলে জ্ঞান করেন। তাঁর জ্বর দূর ক'রে তাঁকে সুস্থ করা তোমার কর্তব্য।' তিনি এ প্রার্থনাও

জানালেন যে, তাঁর মাতাকে দিব্যদৃষ্টি দেওয়া হোক্, জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত করা হোক্। বলাই বাহুল্য যে, এই দুই প্রার্থনাই পূর্ণ হয়েছিল। অলগমাল রোগমুক্ত হয়ে মানামাদুরাই ফিরে গেলেন কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার ফিরে এলেন। কয়েকদিন পরে তাঁর ছোট ছেলে নাগসুন্দরম্-এর স্ত্রী একটি ছেলে রেখে পরলোকগমন করলেন। সুতরাং অলগমালকে আবার ফিরতে হল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি বাকি জীবনটা রমণের কাছে থাকবেন স্থির করে আবার তিরুভন্নমালাই এলেন। তাঁর মাতার প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই রমণ 'বীরুপাক্ষ' গুহা ছেড়ে আরও একটু ওপরে 'স্কন্দাশ্রম'-এ গিয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। এখানে অলগমাল গভীর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করলেন এবং আশ্রমের পাকশালার ভার গ্রহণ করলেন। নাগসুন্দরম্ ও সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে নিরঞ্জনানন্দ নাম নিলেন। রমণের ভক্তদের মধ্যে তিনি তরুণতম 'চিন্নস্বামী' সন্ন্যাসী বলে খ্যাত হলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে রমণের মাতা দূর্বল হয়ে পড়লেন এবং বার্দ্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত হলেন। রমণ অত্যন্ত মমতার সঙ্গে তাঁর সেবাযত্ন করলেন এবং তাঁর শয্যার পাশে বসে এগারো রাত নিদ্রাহীন কাটালেন। ১৯২২ খৃঃ ১৯ মে বৈশাখ মাসে বেহুলা-নবমীর দিন অলগমাল পরলোকগমন করলেন। শেষকৃত্যের জন্য তাঁর দেহ পাহাড়ের দক্ষিণতম বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া হল। পলিতীর্থপুকুর ও দক্ষিণামূর্ত্তি-মণ্ডপের নিকট তাহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হল। শেষকৃত্যের কাজ যতক্ষণ না শেষ হল শ্রীরমণ ততক্ষণ সেখানে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। নিরঞ্জনানন্দ স্বামী সমাধির পাশে বাস করতে লাগলেন। রমণ স্কন্দাশ্রম-এ বাস করলেও প্রতিদিন এসে সমাধি দর্শন করে যেতেন। প্রায় ছয়মাস পরে তিনিও এসে সমাধির পাশে বাস করতে লাগলেন। এ সম্বন্ধে পরে

তিনি বলেছেন যে, ঈশ্বরের নির্দেশেই তিনি সেখানে এসেছিলেন, নিজের ইচ্ছায় নয়। এখানেই রমণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৪৯ সালে সমাধির ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠা হ'ল। যতদিন যেতে লাগল আশ্রম বেড়ে উঠতে থাকল এবং শুধুমাত্র ভারতবাসীই নয়, পৃথিবীর বহুদেশে থেকে ভক্তরা আসতে লাগল।

রমণের প্রথম পাশ্চাত্য ভক্ত ছিলেন এফ্. এইচ. হামফ্রিস্। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুলিশ বিভাগে চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং 'ভেলোরে যোগদান করেন। বিশ্বের রহস্যসন্ধানে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন বলে তিনি একজন মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিলেন। তাঁর তেলেগু শিক্ষক তাঁকে গণপতি শাস্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং গণপতি শাস্ত্রী তাঁকে রমণের কাছে নিয়ে গেলেন। রমণ হামফ্রিস্কে গভীরভাবে অভিভূত করলেন। পরে 'ইন্টার ন্যাশনাল সাইকিক গেজেটে' তাঁর প্রথম দর্শনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে লিখেছেন, 'গুহায় পৌঁছে আমরা তাঁর সামনে পায়ের কাছে নীরবে বসলাম। আমরা বহুক্ষণ এইভাবে বসে রইলাম এবং আমার মনে হল যেন আমি আমার দেহ থেকে উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়েছি। আধঘণ্টা ধরে আমি মহর্ষির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, তাঁর চোখের গভীর ধ্যানের ভাব কখনো পরিবর্তিত হয় নি। মহর্ষির মর্য্যাদাবোধ, ভদ্রতা, সংযম এবং গভীর বিশ্বাসজনিত শক্তি বর্ণনার অতীত।' রমণের সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে হামফ্রিসের আধ্যাত্মিকতার ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। তিনি প্রায়ই রমণের কাছে যেতেন। এক ইংরেজ বন্ধুর কাছে লিখিত চিঠিতে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এবং সে চিঠি পরে উপরোক্ত গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, 'তাঁর হাসির চেয়ে সুন্দর কোন কিছু তুমি কল্পনা করতে পারবে না। তাঁর কাছে গেলে মনে যে কী পরিবর্তন আসে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়।'

আশ্রমে যে শুধু ভাল লোকরাই যেত তা নয়। খারাপ লোক, এমন কি খারাপ সাধুরাও এসে উপস্থিত হত। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে আশ্রমে দু'বার চোর ঢুকেছিল। একবার চুরি করবার মত কিছু না পেয়ে তারা মহর্ষিকে প্রহার করে। এক ভক্ত চোরদের শাস্তি দিতে চাইলে মহর্ষি বারণ করলেন। বললেন, 'আমাদের যেমন ধর্ম আছে তেমনি ওদেরও আছে। আমরা সহ্য করব, ক্ষমা করব। ওদের সঙ্গে গণ্ডগোল না করাই উচিৎ।' একজন চোর মহর্ষির বাম উরুতে ঘুষি মারলে তিনি বললেন, 'বাম উরুতে মেরে তুমি যদি খুশি না হয়ে থাক তা হলে ডান দিকেও মারতে পার।' চোররা চলে গেলে এক ভক্ত তাঁকে মারের কথা জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, 'আমিও কিছু 'পূজা' পেয়েছি।' 'পূজা' শব্দটি দুই অর্থে তিনি ব্যবহার করেছিলেন— 'মার' এবং পূজা'।

অহিংসা তাঁর মধ্যে এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে পশুপক্ষীরাও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করত। মানুষ এবং পশুপক্ষীর প্রতি তিনি সমানভাবেই করুণাপ্রকাশ করতেন। কোন ব্যক্তির উল্লেখের মত তাদেরও তিনি 'সে' বলে উল্লেখ করতেন। পাখী, কাঠবেড়ালী সব এসে তাঁর চারদিকে বাসা বাঁধত, গরু, কুকুর, বাঁদর আশ্রমে এসে বাস করত। তারা সবাই, বিশেষ করে 'লক্ষ্মী' গাই ব্যবহারে রীতিমত বুদ্ধির পরিচয় দিত। মহর্ষি এদের চালচলন ভাল করেই জানতেন এবং এদের খাওয়া-দাওয়া যাতে রীতিমত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এদের কারো মৃত্যু হলে তাকে যথাযথ অনুষ্ঠান সহযোগে কবর দেওয়া হত।

আশ্রমের জীবন স্বচ্ছন্দে বয়ে চলছিল। যতদিন যেতে লাগল দর্শনপ্রার্থী ভক্তের সংখ্যাও তত বাড়তে লাগল, কেউ অল্পদিন আশ্রমে থাকত, কেউ দীর্ঘকাল। আশ্রমও ক্রমশঃ বেড়ে চলল, নতুন নতুন

বিভাগ খোলা হতে থাকল। গোশালা তৈরি হল, বেদ অধ্যয়নের জন্ত স্কুল, গ্রন্থপ্রকাশের জন্ম প্রকাশ বিভাগ। মাতৃ মন্দিরে নিয়মিত পূজা হতে থাকল। রমণের জন্ম একটি হলঘর তৈরি হল যেখান থেকে চারদিকে কি ঘটছে দেখা যেত। রমণ সেখানে বসে থাকতেন। তিনি পাতা গেঁথে খাবার থালা তৈরি করতেন, শক্সী কেটে দিতেন, বইয়ের প্রুফ সংশোধন করতেন, চিঠির উত্তর বলে দিতেন, খবরের কাগজ এবং বই পড়তেন। কিন্তু তবু তিনি যে এসব থেকে বহু উর্দ্ধে রয়েছেন তা অনায়াসেই বোঝা যেত। বাইরে ভ্রমণে যাবার অসংখ্য আমন্ত্রণ আসত, কিন্তু তিরুভন্নমালাই এবং শেষজীবনে আশ্রম ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি। প্রতিদিন, প্রায় সর্বদাই, ভক্তরা তাঁর সামনে নীরবে বসে থাকত। কখনো কখনো কেউ কেউ তু'একটা প্রশ্ন করত, কখনো কখনো তিনি উত্তর দিতেন। সামনে বসে তাঁর হাস্তোভাসিত জ্যোতিপূর্ণ চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবার অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। অনেকের মনে হয়েছে যেন সময় হঠাৎ থেমে গেছে এবং তারা এক অভূতপূর্ব্ব শান্তি অনুভব করছেন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রমণের তিরুভন্নমালাইতে অবস্থানের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শরীর ভাঙতে শুরু করল। বয়স তখনো সত্তর হয়নি, কিন্তু দেখলে মনে হত অনেক বেশি। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে তাঁর বাঁ হাতে কনুইতে একটা ছোট মাংসপিণ্ড দেখা দিল। আরও খানিকটা বেড়ে উঠলে আশ্রমের ডাক্তার মাংসপিণ্ডটা কেটে দিলেন। কিন্তু মাস খানেকের মধ্যেই আবার সেটা দেখা দিল। মাদ্রাজ থেকে সার্জন এসে অস্ত্রোপচার করল। কিন্তু ঘা শুকল না এবং টিউম্যারটা আবার দেখা দিল। পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর 'সারকোমা' হয়েছে। ডাক্তাররা হাতটাকে কনুইয়ের ওপর থেকে কেটে বাদ দিতে চাইলেন। রমণ মৃদু হেসে বললেন, 'ভয়

পাবার কিছু নেই। শরীরটাই ত একটা ব্যাধি। একে স্বাভাবিকভাবে শেষ হতে দাও, অঙ্গহানি করে কি হবে? ঘা-টাকে একটু ব্যাণ্ডেজ করে দিলেই চলবে।' তারপরেও দু'বার অস্ত্রোপচার করা হয়, তবু আবার টিউমার দেখা দিল। দেশজ ঔষধ ব্যবহার এবং হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসাও করান হল। কিন্তু কোন ফল হল না, অসুখ সারল না। মহর্ষি রমণ কিন্তু এই যন্ত্রণার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। তিনি বসে বসে দেখতে লাগলেন শরীরটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁর চোখ আগের মতই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল এবং সর্বজীবের প্রতি তাঁর প্রীতি ও করুণা প্রবাহিত হতে লাগল। তাঁর দর্শনলাভের জন্য প্রচণ্ড ভীড় হতে শুরু করল। রমণ কিছুতেই তাদের বঞ্চিত করতে রাজী হলেন না। ভক্তরা একান্তভাবে চাইছিল মহর্ষি তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে নিজেকে রোগমুক্ত করুন। কেউ কেউ নিজেদের জীবনে রমণের সেই অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাব অনুভব করেছেন বলে মনে করেন। যারা মহর্ষির শারীরিক যন্ত্রণায় মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন তাদের প্রতি মহর্ষির গভীর সহানুভূতি ছিল। তিনি তাদের এই বলে সান্ত্বনা দিতেন যে দেহটা ভগবান নয়। বলতেন, 'ওরা শরীরটাকেই ভগবান বলে মনে করে এবং তার যন্ত্রণা ভগবানে আরোপ করে। ওরা কাতর হয়ে ভাবে যে ভগবান ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু সে কোথায় যাবে, কি করেই বা যাবে?'

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল মহর্ষি দেহরক্ষা করলেন। সেদিন সন্ধ্যায় যারা তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন তাদের তিনি দর্শন দিলেন। আশ্রমের সকলেই জানত শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। তারা অরুণাচলের উদ্দেশ্যে লিখিত রমণের গান গাইতে লাগল। মহর্ষি তাঁর সেবকদের বললেন তাঁকে ধরে বসিয়ে দিতে। তিনি মুহূর্তের জন্য তাঁর জ্যোতির্মান করুণাসিগ্ধ চক্ষু উন্মোচন করলেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি

ফুটে উঠল এবং চোখের কোন থেকে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে নেমে এল। ৮।৪৭ মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হল। কিন্তু কোন শারীরিক যন্ত্রণার লক্ষণ দেখা গেল না, মৃত্যুর কোন চিহ্ন প্রকাশ পেল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি উল্কা ধীরে ধীরে আকাশের পথ পার হয়ে পবিত্র পাহাড় অরুণাচলের চূড়ায় পৌঁছল এবং তার পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহর্ষি কচিৎ কখনো লিখতেন। যেটুকু গদ্য এবং পদ্য তিনি লিখেছেন তা শুধু তাঁর ভক্তদের দাবী মেটাবার জন্যে। একবার তিনি নিজেই বলেছিলেন, 'যে কোন কারণেই হোক্ বই লেখা বা কবিতা লেখার কথা আমার মনেই হয় না। আজ অবধি যত কবিতা আমি লিখেছি তার সবই, কারো না কারো অনুরোধে অথবা বিশেষ কোন ঘটনা উপলক্ষ্যে।' তাঁর সব চেয়ে মূল্যবান রচনা হচ্ছে, 'অস্তিত্ব বিষয়ক চল্লিশটি শ্লোক'। তাঁর 'উপদেশসারম্' পদ্যে লেখা বেদান্তের সারমর্ম। অরুণাচলের উদ্দেশ্যেও তিনি পাঁচটি শ্লোক রচনা করেছিলেন এবং শঙ্করের 'বিবেকচূড়ামণি' ও 'আত্ম-বোধ' তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর প্রায় সব রচনাই তামিলে। কিন্তু সংস্কৃত, তেলেগু এবং মালয়ালম-এও তিনি কিছু কিছু রচনা করেছেন।

অদ্বৈত বেদান্তের মত রমণের দর্শনের মূল কথা আত্মোপলব্ধি। তাঁর দর্শনে আত্মার প্রকৃতি এবং 'আমি'-র ধারণার অন্তর্গত বিষয়ের অনুসন্ধানই প্রধান পথ হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে। সাধারণতঃ 'আমি' কথার মধ্যে নানা জটিল অর্থ জড়িয়ে থাকে যদিও সে সব তার প্রকৃত অর্থ নয়। যেমন আমরা দেহকেও 'আমি' বলে উল্লেখ করি। বলি, 'আমি মোটা', 'আমি রোগা' ইত্যাদি কিন্তু এ ব্যবহার যে ভুল তা সহজেই বোঝা যাবে। শুধুমাত্র দেহ নিজেকে আমি বলে উল্লেখ করতে পারে না, কেননা সে ত নিষ্প্রাণ। সাধারণ অশিক্ষিত ব্যক্তিও 'আমার

শরীর' একথার অর্থ বুঝতে পারে। 'আমি' এবং 'অহংকার' যে সমার্থক নয় এ উপলব্ধি অবশ্য সহজে হয় না। কারণ, অনুসন্ধিৎসু মনই হচ্ছে 'অহং' এবং তার মৃত্যু না হলে 'আমি'র সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা যায় না। ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই সহজ নয়। জ্ঞানের আগুনে 'অহং'কে অর্পণ করা সব চেয়ে বড় ত্যাগ।

আত্মা এবং অহং-এর পৃথকীকরণ সহজ নয় সত্য, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমাদের ঘুমের অভিজ্ঞতার কথা ভাবলেই পৃথকীকরণ সহজবোধ্য মনে হবে। ঘুমের মধ্যে অহং-এর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। অহং আর তখন কাজ করে না। কিন্তু আত্মা অহং-এর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে এবং অন্যান্য বস্তু ও দেখে। ঘুমের মধ্যেও যদি আত্মা উপস্থিত না থাকত তা হলে ঘুম থেকে উঠে কেউ বলত না, 'আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছিলাম ; কিছু টেরই পাই নি।

তা হলে আমাদের মধ্যে দুটি 'আমি' আছে, একটি নকল এবং একটি খাঁটি। নকল 'আমি'ই হচ্ছে অহং এবং খাঁটি 'আমি' আত্মা। অহং এবং আত্মার ধারণ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে যে মুখোশহীন অহং আমরা প্রায় দেখতেই পাই না। তদুপরি আমাদের সব অভিজ্ঞতাই অহংকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে অহংও জেগে ওঠে এবং সমস্ত পৃথিবীও যেন তার সঙ্গে জাগ্রত হয়। তাই অহং আমাদের কাছে এত প্রাধান্যলাভ করে।

আসলে অহং একটি তাসের দুর্গ। অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেই সে দুর্গ ভেঙে পড়বে। কিন্তু অনুসন্ধানের জন্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু মন চাই, যা বিষয় বস্তুর রহস্যবিশ্লেষণকারী মনের চেয়েও তীক্ষ্ণ। বুদ্ধির একমুখিনতা দ্বারাই সত্যকে দেখতে হবে এবং জ্ঞানোদয়ের পূর্বে আবার সেই বুদ্ধিও বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তার পূর্ব পর্যন্ত কঠোর অনুসন্ধান করে যেতে হবে। আলস্যপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়।

'আমি কে'—এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য মনের প্রকৃতি বোঝা নয়। এর উদ্দেশ্য পুরো মনটাকে তার উৎসের দিকে সন্নিবেশ করা। নকল 'আমি'র উৎস হচ্ছে আত্মা। যিনি আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন তিনি মনের স্রোতের সঙ্গে ছুটবেন না, তার গতি হবে স্রোতের উল্টো দিকে এবং অবশেষে তিনি মনোময় জগতের উর্দ্ধে যাবেন। নকল 'আমি'র উৎস আবিষ্কৃত হলেই তার মৃত্যু। তখন আত্মা উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত থাকে এবং তারই নাম উপলব্ধি ও মুক্তি।

মুক্তির সঙ্গে দেহের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন মহর্ষির ক্ষেত্রে হয়েছিল তেমনি দেহটা হয়ত বেঁচে থাকতে পারে, পৃথিবীটা হয়ত প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু যে আত্মা জাগ্রত হয়েছে তার কাছে এই জগৎ প্রতীতির কোন অর্থ নেই। বস্তুতঃ যার আত্মা জাগ্রত হয়েছে তার পক্ষে দেহ ও নেই, পৃথিবীও নেই, শুধু আত্মা আছে যাহা সৎ চিৎ এবং আনন্দ। এ ধরণের অভিজ্ঞতা যে আমাদের একেবারে হয় না তা নয়। ঘুমের মধ্যে যখন বাইরের জগৎ বা স্বপ্নের জগৎ সম্বন্ধে সচেতন থাকি না তখন আমরা সে অভিজ্ঞতা লাভ করি, যদিও তা অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। তাই আমরা স্বপ্নের অলৌকিকতাতে সচেতন হই এবং বাস্তব জগতে ফিরে আসি। অবিদ্যার বিলোপ হলে তবেই এই দ্বৈতে প্রত্যাবর্তন শেষ হয়। বেদান্তের লক্ষ্যই তাই। নিম্নতম স্তরের মানুষকেও হতাশা থেকে আশার আলোকে উত্তীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করাই মহর্ষির মত মহান উদাহরণের মূল মর্ম।

—:*:—
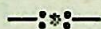
শ্রীরমণাশ্রমম্, তিরুভন্নমালাই

আদর্শ ও কর্মসূচী

শ্রীরমণাশ্রমম্—যেখানে মহর্ষি রমণ বাস করতেন এবং যেখানে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের শাশ্বত বাণী প্রচার করেছেন—অরুণাচলম্ শহরের পশ্চিম প্রান্তে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যবহুল পরিবেশে অবস্থিত। আশ্রমের অট্টালিকায় শান্তি এবং সৌন্দর্য বিরাজ করছে, নানারকম কাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্জন ধ্যানের পক্ষে আশ্রমটি একটি আদর্শ স্থান। সমস্ত দেশের মানুষ আশ্রমকে তাদের গৃহ বলে মনে করে। এটা উপলব্ধিতেই বিশ্বাস হইবে।

ভগবান্ শ্রীরমণ মহর্ষির যে সব ভক্ত তাঁর মহানির্বানের পর আশ্রমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন নি তারা আশ্রমের কর্মপ্রণালী জানবার জন্যে প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করেন। আমরা তাদের জানাতে চাই যে আশ্রমের কাজ মহর্ষির মহানির্বাণের পূর্বে যেমন চলছিল এখনও তেমনিই চলছে। আশ্রমের দৈনন্দিন কর্মসূচী এইরূপ :

১। শ্রীরমণাশ্রমম্ ভগবান্ শ্রীরমণের স্বর্গীয় সুষমায় পরিপূর্ণ। তার ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভক্তরা এখানে এসে মানসিক শান্তি, ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং আনন্দলাভ করে। ভক্তরা যাতে তা লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য। ভোর এবং সন্ধ্যায় বহু ভক্ত নীরব ধ্যান এবং প্রার্থনার জন্য এখানে সমবেত হয় এবং সেজন্য তাদের প্রয়োজন মত সাহায্য লাভ করে।

২। শ্রীভগবান্ রমণ এবং তাঁর মাতার মহাসমাধিতে সকাল এবং সন্ধ্যায় পূজা দেওয়া হয়।

৩। সকাল এবং সন্ধ্যায় বেদপাঠ করা হয়। আরতির সময় ভক্তরা সমবেত হয়।

৪। যে পুরানো হল ঘরে শ্রীভগবান্ রমণ বসতেন ভক্তরা সেখানে বসে ধ্যান করেন, কারণ সেই হলটি তাদের ধ্যানে অনুপ্রাণিত করে।

৫। যে ঘরে মহর্ষি মহানির্বান লাভ করেছিলেন সে ঘরটিকে সব ভক্তরা অত্যন্ত পবিত্র বলে জ্ঞান করেন।

৬। নতুন হলঘরে ভক্তদের ছোট ছোট দলের বৈঠকে শ্রীভগবানের উপদেশ পঠিত এবং আলোচিত হয়।

৭। মাঝে মাঝে অথবা পর পর কয়েকদিন ধরে যোগ্য ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক এবং দর্শন বিষয়ে ভাষণ দেন।

৮। যেমন নিকটের তেমনি দূরের ভক্তরা আশ্রম দর্শনে আসেন। আশ্রমেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় এবং তারা যাতে আরামে থাকতে পারেন শ্রীভগবানের করুণার প্রসাদলাভ করতে পারেন ও আশ্রমের শান্তি উপভোগ করতে পারেন তার জন্য সমস্তরকম চেষ্টা করা হয়।

৯। 'বেদপাঠশালা' আশ্রমের একটি অঙ্গ। যে বালকরা সেখানে শিক্ষালাভের জন্য আসে আশ্রম তাদের বিনামূল্য শিক্ষাদান এবং খাওয়া থাকার ব্যয় বহন করে। তাদের যজুর্বেদ, সংস্কৃতসাহিত্য, ইংরেজী, তামিল, অঙ্ক এবং সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দান করা হয়।

১০। শ্রী মাতার মন্দিরের বেদিতে শ্রীচক্র স্থাপিত। শ্রীভগবান্ তাকে স্পর্শ করে পবিত্র করেছেন। প্রতি শুক্রবার, পূর্ণিমা এবং তামিল মাসের প্রথম দিন শ্রীচক্রের বিশেষ পূজানুষ্ঠান হয়। ভক্তরা এসব পূজায় যোগদান এবং তার শুভ ফল লাভের জন্য আগ্রহপ্রকাশ করেন।

১১। গোশালা পূর্বের মতই আদর্শ অবস্থায় আছে। আশ্রমবাসী এবং অতিথি ভক্তদের জন্য যথেষ্ট পরিমানেই দুধ পাওয়া যায়।

১২। আশ্রমের পাকশালা পূর্বের মতই চলিতেছে এবং প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন আশ্রমবাসী, অতিথি ভক্ত এবং বেশ কিছু সংখ্যক দরিদ্রের জন্য খাবার সংস্থান করা হয়।

১৩। পূর্বের মতই দাতব্য চিকিৎসালয়টি এখনও নিয়মিতভাবে কাজ করছে এবং ডাক্তার সর্ব্ব প্রযত্নে বিনাবেতনে চিকিৎসা করছেন। প্রতিদিন অন্ততঃ একশ' বাইরের রোগী চিকিৎসার জন্য আসে, তাছাড়া কিছু 'বেড'ও আছে।

১৪। আশ্রম নতুন নূতন বই প্রকাশ করে যাচ্ছে এবং পূর্ব্ব প্রকাশিত বই-এর নূতন সংস্করণ নানা ভাষায় সঙ্কলিত করছে। শ্রীভগবানের যে সব কথা তখনই লিখে নেওয়া হয়েছিল তা প্রকাশিত হচ্ছে এবং শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত 'শ্রীরমণ বাণী' শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। 'শ্রীরমণ মহর্ষির সঙ্গে কথপোকথন' তার সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। তিনটি ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। ইংরেজীতে লিখিত 'শ্রীভগবনের সঙ্গে দিনের পর দিন' গ্রন্থখানি. দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। এ ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

১৫। ভক্তদের ব্যবহারের জন্য আশ্রমে যে বিস্তৃত লাইব্রেরীটি আছে তার বইর মোট সংখ্যা ৪০০০ থেকে ৫০০০। সে সব বই বিভিন্ন ভাষায় লিখিত দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক।

১৬। আশ্রমটিকে শ্রীভগবানের বানী প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগের মত এখনও ভক্তরা শ্রীভগবনের পীঠস্থানে স্বাগত।

১৭। আশ্রম স্থায়ী সভ্যদের পূর্ণতালিকা রাখে। ভক্তরা বছরে ৫৲ টাকা চাঁদা দিলেই সভ্য হতে পারেন। আশ্রম সভ্যদের সঙ্গে

চিঠিপত্রের মারফৎ যোগাযোগ রক্ষা করে, অন্ততঃ শ্রীভগবনের জয়ন্তী এবং আরাধনার পূর্বে এবং পরে। সভ্যদের চাঁদার টাকা আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণেই খরচ করা হয়।

১৮। সে সব ভক্তরা শ্রীভগবানের আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণে আগ্রহী তারা সভ্যতালিকাভুক্ত হলে আশ্রম উপকৃত হইবে।

১৯। ভক্তদের স্বেচ্ছাকৃত দানের অর্থ দ্বারাই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহিত হয়।

শ্রীভগবনের করুণা সকলের ওপর নির্ঝরে বর্ষিত হোক্ এই প্রার্থনা।

আমি কে?

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির উপদেশমূলক
তামিল পুস্তকের বঙ্গানুবাদ

শ্রীরমণাশ্রম
তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণ ভারত

আমি কে ?

প্রস্তাবনা

ভগবান্ শ্রীরমণ মহর্ষির নাম অধুনা জগদ্বিখ্যাত। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র সপ্তদশ বৎসর বয়সেই আত্মার অমরত্ব উপলব্ধির অনন্তর গৃহত্যাগ করতঃ কিঞ্চিন্নূন অর্দ্ধশতাব্দিকাল জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ং শিবরূপী শ্রীঅরুণাচল গিরির পাদদেশে বাস করিতেছেন। এখন, একটি দিন তিনি শ্রীরমণাশ্রমে উপস্থিত না থাকিলে দর্শনার্থী কত লোক বিফল মনোরথ হইবেন।

ভগবান্ শ্রীমহর্ষির আত্ম-সাক্ষাৎকারের সন্ধান যাহারা প্রথমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীশিবপ্রকাশম্ পিল্লে মহাশয় তাহাদের অন্যতম। ১৯০১-২ খৃঃ শ্রীমহর্ষি মৌনাবস্থায় উক্ত পিল্লে মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই এই অমর পুস্তিকা "নানার" —"আমি কে?" রূপ লাভ করিয়াছে। ইহা বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং পঁয়ত্রিশ হাজারের ও অধিক পুস্তক ইতিমধ্যে বিক্রীত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুবাদ করা হইল। এই অনুবাদে মূল তামিল পুস্তিকার ভাব ও ভাষার যথাসাধ্য অনুবর্ত্তী হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

পরিশিষ্টে শ্রীমহর্ষির স্বরচিত একই শ্লোকে "আমি কে?" —এরূপ বিচারের সার মর্ম্ম সানুবাদ দেওয়া হইল।

এই পুস্তিকা অবলম্বন করিয়াই জিজ্ঞাসু আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, ভগবান্ শ্রীমহর্ষি এরূপ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের এই আশীর্ব্বচন ধারণ করিয়া মুমুক্ষুগণ কৃতকৃত্য হউন। ওম্।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির "আমি কে" পুস্তিকার বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণ অগণিত বাঙ্গালী ভক্তমণ্ডলীর প্রয়োজনে সংস্কলিত করা হইল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় শ্রীমহর্ষি 'স্থূল শরীরে' আমাদের মধ্যে ছিলেন। আজ হইতে অধিকতর ১২ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ ১৯৫০ ইং ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ) বঙ্গাব্দ তারিখে সন্ধ্যা ৮টা ৪০ মিনিটে মহর্ষি মহানির্ব্বান প্রাপ্ত হন। ঠিক সেই মহানির্ব্বান মুহুর্ত্তে আশ্রমে উপস্থিত অগণিত ভক্তমণ্ডলী নভোমণ্ডলে এক অতি-উজ্জ্বল-শুভ্র আলো শিখা আশ্রম প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া শ্রীশ্রীঅরুণাচলম্ মন্দিরে মিলাইয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ করেন। মহর্ষি যে পরম পিতার অনুসন্ধানে প্রথম জীবনে বাহির হইয়াছিলেন-অন্তে-তিনি সেই পরমপিতার অঙ্কেই স্থান পাইলেন-এ ঘটনা ইহারই প্রমাণ্য।

মহানির্ব্বাণের কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও মহর্ষি ক্রন্দনরত ভক্তমণ্ডলী উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন "আমি তো যাইতেছিনা—আমার নশ্বর দেহটাই যাইতেছে সুতরাং তোমাদের চিন্তাকুল হওয়ার কারণ কি ?"

আজিও আশ্রমে হাজার হাজার ভক্তমণ্ডলী শ্রীভগবাণের সমাধির নিকট বসিয়া তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করেন ও ধ্যানের অনুপ্রেরণা পান। যাহাতে শ্রীভগবাণের প্রাণস্পর্শী বাণী সকল বাঙ্গালী ভক্তমণ্ডলী উপলব্ধি লাভ করিতে পারেন সেজন্য দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন আছে তাই উহা প্রকাশ করা হইল। শ্রীভগবাণের করুণা সকলের উপরে নির্ঝরে বর্ষিত হউক এই প্রার্থনা। শ্রীরমণ জয়তু।

ইতি—

১লা জুলাই, ১৯৬২ ইং।

শ্রীশ্রীরমণ আশ্রম
তিরুভন্নমালাই।

ওঁ

নমো ভগবতে শ্রীরমণায়

আমি কে ?

যে হেতু সকল জীবই সর্ব্বদা দুঃখলেশ রহিত সুখ চায়, যে হেতু প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাকেই পরম প্রিয় বোধ করে, যে হেতু সুখাভিলাষই প্রিয়ত্বের কারণ, সেই হেতু মনোবিহীন নিদ্রাকালে প্রত্যহ অনুভূত নিজ স্বাভাবিক সুখের উপলব্ধির নিমিত্ত আপনি আপনাকে জানা অত্যাবশ্যক। তাহার জন্য "আমি কে ?"—এই জ্ঞান বিচারই মুখ্য সাধন।

তবে আমি কে ? সপ্তধাতু নির্ম্মিত এই স্থূল শরীর আমি নহি। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ নামক পঞ্চ বিষয় এবং উহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও নাসিকা নামক পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও আমি নহি, তেমনই বচন, গমন, দান, মলবিসর্জ্জন এবং আনন্দগ্রহণ—এই পঞ্চবিধ কর্ম্মের করণ বাক্, পাদ, পানি, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও আমি নহি। শ্বাসাদি পঞ্চক্রিয়াত্মক প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকও আমি নহি। মননাত্মক মনও আমি নহি। আবার সর্ব্ববিষয় ও সর্ব্ব বৃত্তি শূন্য বাসনামাত্রাবশেষ অজ্ঞানও আমি নহি।

'আমি ইহা নহি', 'আমি ইহা নহি' এইরূপে পূর্ব্বোক্ত সকল উপাধি বর্জ্জন করিলে সর্ব্ববিলক্ষণ যাহা থাকে সেই জ্ঞান মাত্রই আমি। জ্ঞানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ।

সকল বিষয় জ্ঞানের সাধন ও সকল বৃত্তির কারণ মন লয় প্রাপ্ত হইলে জগৎ দৃষ্টি দূর হয়। যে প্রকার কল্পিত সর্পজ্ঞান অপগত না হইলে উহার অধিষ্ঠান রজ্জুর জ্ঞান হয় না, সেই প্রকার কল্পিত জগৎদৃষ্টি দূর না হইলেও উহার অধিষ্ঠান স্বরূপের দর্শন সম্ভব হয় না।

মন আত্মস্বরূপে অবস্থিত এক আশ্চর্য্য-শক্তি। ইহাই সকল বৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। পরন্তু, সকল বৃত্তি নিঃশেষে দূর করিলে দেখিবে, মন বলিয়া কোন পৃথক্ বস্তু নাই। অতএব বৃত্তি বা চিন্তাই মনের স্বরূপ। চিন্তা ব্যতীত জগৎ বলিয়া অন্য কোন বস্তু নাই। সুষুপ্তিতে চিন্তা নাই। জগৎও নাই ; জাগ্রতে ও স্বপ্নে চিন্তা আছে, জগৎও আছে। মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে সৃষ্ট সূত্র বাহির করিয়া পুনরায় উহা নিজেরই ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়, মনও তেমন স্বস্থান হইতে জগৎ প্রতীতি বিস্তার করিয়া পুনরায় উহা আপনার ভিতরে গুটাইয়া লয়। মন আত্ম স্বরূপ হইতে যখন বহির্গত হয়, তখন জগৎ 'প্রতিভাত' হয়। সুতরাং যখন জগৎ প্রকাশিত হয়, তখন স্বরূপ প্রকাশিত হয় না ; যখন স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তখন জগৎ প্রকাশিত হয় না। মনের স্বরূপ যদি ক্রমাগত বিচার করা যায়, তবে মন 'আপন' রূপেই পর্য্যবসিত হয়। এই 'আপন' রূপ আত্মস্বরূপই মন, সতত স্থূল কিছু অনুসরণ করিয়াই দাড়ায় ; পৃথক্ দাড়ায় না। বস্তুতঃ মনকেই সূক্ষ্ম শরীর এবং জীব বলা হয়।

এই দেহে 'আমি' রূপে যাহা উদিত হয় উহাই মন। এই অহং-ভাব শরীরে প্রথমে কোন্ স্থানে স্ফুরিত হয় তাহা বিচার করিলে, হৃদয়ে হয় বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। এমতে হৃদয়ই মনের জন্ম-স্থান। সতত 'আমি' 'আমি' এইরূপ খেয়াল রাখিলেও ঐখানেই পৌঁছাইয়া দিবে। মনে যত বৃত্তি ওঠে তাহাদের মধ্যে অহং-বৃত্তিই মূল ও প্রথম বৃত্তি। ইহার উদয় হইলেই, পশ্চাৎ আর সব চিন্তার উদয় হয়। উত্তম পুরুষ 'আমি'র উদয় হইলে পরেই, মধ্যম পুরুষ 'তুমি' ও প্রথম পুরুষ 'সে'র স্ফুরণ হয় ; উত্তম পুরুষ ব্যতীত মধ্যম ও প্রথম পুরুষ থাকে না। "আমি কে ?"—এইরূপ বিচার দ্বারাই মনের দমন হয়। "আমি কে" —এই বিচারণাই অন্যান্য সকল চিন্তার লোপ করিয়া শবদাহক বংশ-দণ্ডের ন্যায় পরিণামে স্বয়ং লোপ প্রাপ্ত হয়। এই বিচারণার মধ্যে

যদি অন্য সব চিন্তা ওঠে, তবে তাহাদের পূর্ত্তি করিবার যত্ন না করিয়া, 'ঐ সব চিন্তা উদিত হইয়াছে কাহার?' তাহা বিচার করা চাই। এই বিচারকালে যত চিন্তা ওঠে উঠুক, প্রত্যেকটি চিন্তার উদয়কালেই 'ইহা উঠিয়াছে কাহার?'—এইরূপ সাবধানে বিচার করিলে, 'আমার' —এইরূপ বোধ হইবে। অতঃপর 'আমি কে?'—এইরূপ বিচার করিলে মন নিজ জন্মস্থান হৃদয়ে প্রত্যাবৃত হয় এবং উদিত চিন্তাও বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার অভ্যাস করিতে করিতে মনের নিজ জন্মস্থানে স্থিত হইয়া থাকার শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। সূক্ষ্ম মন মস্তিষ্ক শক্তি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্ম্মুখ হইলে স্থূল নাম-রূপ আবির্ভূত হয়। পরন্তু হৃদয়ে অবস্থান করিলে নাম-রূপ তিরোহিত হয়। মনকে বহির্ম্মুখ হইতে না দিয়া হৃদয়ে রাখিয়া থাকারই নাম অহম্মুখতা বা অন্তর্ম্মুখতা। হৃদয় হইতে বাহিরে যাইতে দেওয়ারই নাম বহির্ম্মুখতা। এবম্বিধ রীতিতে মন হৃদয়ে স্থিত হইলে সকল বৃত্তির যাহা মূল সেই অহংভাব লোপ পাইলে নিত্য-বর্ত্তমান সদ্‌বস্তু 'নিজে' মাত্র প্রকাশিত থাকে। যে অবস্থায় অহংভাব কিঞ্চিৎমাত্রও থাকে না তাহাই স্বরূপস্থিতি। বস্তুতঃ উহাকেই মৌন বলা হয়। এই মৌন স্থিতিরই অপর নাম জ্ঞান-দৃষ্টি। আর, তাহারই অর্থ মনকে আত্মস্বরূপে লয় করা। অন্যথা অন্যের মনের কথা জানা, ত্রিকালজ্ঞ হওয়া, দূর দেশের ঘটনা অবগত হওয়া ইত্যাদিকে জ্ঞান-দৃষ্টি বলা যায় না।

যথার্থ কি? কেবল আত্মস্বরূপই যথার্থ। শুক্তিতে রজতের ন্যায় জগৎ জীব এবং ঈশ্বর আত্মস্বরূপে কল্পিত মাত্র। এই তিনটি একই কালে আবির্ভূত হয় এবং একই কালে অন্তর্হিত হয়। বস্তুতঃ স্বরূপই জগৎ, স্বরূপই 'আমি' (জীব), স্বরূপই ঈশ্বর; সবই শিবস্বরূপ।

মনোপশমের জন্য আত্ম-বিচার ব্যতীত অন্য যথোচিত উপায় নাই উপায়ন্তরে মনোলয় সাধিত হইলে কিছুকাল লীনবৎ থাকিয়া সুপ্ত মন পুনরায় জাগিয়া উঠে। প্রাণায়াম দ্বারাও মনোনিগ্রহ হয় ; কিন্তু প্রাণ যতক্ষণ লীন থাকে মনও ততক্ষণ লীন থাকে ; প্রাণায়াম বন্ধ করিলেই মনও বহির্মুখী হইয়া বাসনাবশে ঘুরিয়া হয়রাণ হয়। মন ও প্রাণের জন্মস্থান একই। চিন্তাই মনের স্বরূপ। অহং-বৃত্তিই মনের প্রথম বৃত্তি এবং উহাই অহঙ্কার। যেখান হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, সেখান হইতেই শ্বাস উদ্‌গত হয়। এই কারণে মন শান্ত হইলে প্রাণও শান্ত হয়, প্রাণ শান্ত হইলে মনও শান্ত হয়। কিন্তু, সুষুপ্তিতে মন সুপ্ত থাকিলেও প্রাণ শান্ত হয় না। দেহ মৃত হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইতে না পারে এই নিমিত্ত, দেহের রক্ষার জন্য ঈশ্বর কর্ত্তৃক এই প্রকার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জাগ্রতে এবং সমাধিতে প্রাণ লীন হইলে মনও লীন হয়। প্রাণ মনেরই স্থূল রূপ। মরণকাল পর্য্যন্ত মন প্রাণকে শরীরে ধারণ করিয়া মৃত্যুকালে উহাকে বেষ্টন করিয়া নিয়া প্রস্থান করে। এই হেতু প্রাণায়াম মনোলয়ের সহায়তা ছাড়া মনোনাশ করে না।

মনোনিগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত মূর্ত্তিধ্যান, মন্ত্র-জপ আহার-সংযম প্রভৃতি প্রাণায়ামের ন্যায়ই সহায়ক বটে। মূর্ত্তি-ধ্যান ও নাম-জপ দ্বারা মন একাগ্রতা লাভ করে। সর্ব্বদা চলনশীল হস্তী-শুণ্ডে একটি শৃঙ্খল প্রদান করিলে সেই হস্তী যেমন অন্য কিছু গ্রহণ না করিয়া উহাই লইয়া চলিতে থাকে, সদা চঞ্চল মনও সেই প্রকার কোন নাম বা রূপে অভ্যস্ত হইলে উহাই ধারণ করিয়া থাকে। মন অসংখ্য চিন্তারূপে বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া প্রত্যেকটি চিন্তা অতি বলহীন হয়। চিন্তারাশি প্রশমিত হইতে হইতে একাগ্রস্থিতি লাভ করিয়া তাহা হইতে বল প্রাপ্ত মনের পক্ষে আত্ম-বিচার সুলভে সিদ্ধ হয়। সকল নিয়মের শীর্ষস্থানীয়

সাত্ত্বিক মিতাহারের নিয়ম হইতে মনের সত্ত্বগুণ বাড়িয়া আত্মবিচারে সহায় হয়।

পরম্পরাগত বিষয়বাসনা সমূহ অগণ্য সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় প্রতীত হইলেও স্বরূপ ধ্যান বর্দ্ধিত হইতে হইতে সে সমস্ত অন্তর্হিত হয়। সকল বাসনা ক্ষীণ হইলে পরে স্বরূপমাত্রে অবস্থান সম্ভব কি না এরূপ সন্দেহাত্মক চিন্তারও অবসর না দিয়া প্রযত্ন শিথিল না করিয়া স্বরূপধ্যানে লাগিয়া থাকা চাই। কোন ব্যক্তি যতই পাপী হউক না কেন, "হায়! আমি পাপী, কিরূপে পরিত্রাণ পাইব?"—এইরূপ বিলাপপূর্ব্বক ক্রন্দনপরায়ণ না হইয়া সে যে পাপী এই চিন্তাও তাড়াইয়া দিয়া দৃঢ়তা সহকারে স্বরূপ ধ্যানে লাগিয়া থাকিলে সে নিশ্চয়ই নব-জীবন প্রাপ্ত হইবে।

মনে যাবৎকাল পর্য্যন্ত বিষয়বাসনা সমূহ থাকিয়া যায় তাবৎকাল পর্য্যন্তই "আমি কে?"—এইরূপ বিচারও আবশ্যক। চিন্তাসমূহ উঠিবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে সম্যক্‌, উহাদিগের উৎপত্তি স্থানেই বিচারণা দ্বারা নাশ করিতে হইবে। অন্য কিছু না চাহিয়া থাকা—বৈরাগ্য বা আশা-ত্যাগ ; আত্ম স্বরূপ ত্যাগ না করাই জ্ঞান। যথার্থতঃ বৈরাগ্য ও জ্ঞান দুইই এক। মুক্তান্বেষী ডুবুরীরা কটিদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া ডুব দিয়া সাগরের তলদেশস্থিত মুক্তা যেমন গ্রহণ করে, তেমন প্রত্যেক ব্যক্তি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া নিজের অভ্যন্তরে ডুব দিয়া আত্ম-মুক্তা পাইতে পারে। কেহ নিজ স্বরূপ প্রাপ্তি পর্য্যন্ত নিরন্তর স্বরূপ স্মরণ করিয়া থাকিতে পারিলে, একমাত্র উহাই যথেষ্ট। দুর্গের ভিতরে যাবৎ শত্রুরা থাকিবে তাবৎ উহা হইতে বাহিরে আসিতেই থাকিবে ; আসামাত্রই উহাদিগকে নিঃশেষে কর্ত্তন করিতে থাকিলে দুর্গ হস্তগত হইবে। চিন্তাগুলিই দুর্গস্থ শত্রু সদৃশ।

ঈশ্বর এবং গুরু যথার্থতঃ ভিন্ন নহেন। ব্যাঘ্রের কবলে নিপতিত শিকার যেরূপ কোনপ্রকারে ফিরবে না, তদ্রূপ শ্রীগুরুর কৃপাকটাক্ষে যাহারা পতিত হইয়াছেন তাহারা তাঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবেন ব্যতীত কোন কালেও পরিত্যক্ত হইবেন না; সেজন্য শ্রীগুরু কৃপালাভের নিমিত্ত তৎপ্রদর্শিত মার্গানুসারে অক্ষুন্ন ভাবে চলা আবশ্যক।

আত্মচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা উদয়ের বিন্দুমাত্র অবসর না দিয়া আত্মনিষ্ঠাপর থাকাই নিজেকে ঈশ্বরে সমর্পণ করা বা শরণাগতি। ঈশ্বরের উপর যত গুরুভারই অর্পণ কর না কেন, উহা সমস্তই তিনি বহন করেন। সকল কার্য্যই এক পরমেশ্বর শক্তি চালাইতেছেন বলিয়া আমরাও উঁহার অধীন না হইয়া "এরূপ করা চাই, ওরূপ করা চাই"— এই প্রকার সদা চিন্তন করিব কেন? বাষ্পীয় শকট বা রেল গাড়ী সকল ভারই বহন করিয়া গমন করিতেছে জানিয়াও, উহাতে আরোহণ করিয়া গমনকারী আমরা, আমাদের বোঝাও উহাতে রাখিয়া সুখে না থাকিয়া উহা আমাদের শিরোপরি বহন করিয়া কষ্ট পাইব কেন?

সুখ আত্মারই স্বরূপ; সুখ আত্মস্বরূপ ভিন্ন নহে। আত্ম-সুখই সত্য; এবং উহাই একমাত্র সত্য। সাংসারিক বস্তু সমূহের একটিতেও সুখ বলিয়া কিছু নাই। "উহাদিগের নিকট হইতে সুখ পাইতেছি" আমরা আমাদের অবিবেক বশতঃই এরূপ মনে করি। মন বাহিরে যখন যায় তখন দুঃখ অনুভব করে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইচ্ছা সমূহের পূর্ত্তি হওয়া মাত্র, সর্ব্বদা মন উহার যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মসুখই অনুভব করে। ঐরূপেই সুষুপ্তি, সমাধি ও মূর্চ্ছা দশায়, ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তিতে ও বিদ্বিষ্ট বস্তুর ক্ষতিতে মন অন্তর্ম্মুখ হইয়া সাময়িকভাবে আত্মসুখই অনুভব করে। এই প্রকারে মন আত্মাকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে গমন করিয়া পুনঃ ভিতরে ফিরিয়া অবিরাম ঘুরিয়া বেড়ায়। বৃক্ষতলে সুখকর ছায়া, বাহিরে কঠোর

সূর্য্যতাপ। বাহিরে ঘুরিয়া একজন ছায়ায় যাইয়া শীতল হয়। কিছুকাল পরে বাহিরে গিয়া তাপের কঠোরতা সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় তরুমূলে আসে। এই প্রকার ছায়া হইতে রৌদ্রে, রৌদ্র হইতে ছায়ায় সে গমনাগমন করে। এইরূপ আচরণকারী, অবিবেকী। কিন্তু, বিবেকী ছায়া ছাড়িয়া সরে না। সেই প্রকারই জ্ঞানীর মনও ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সরে না। কিন্তু অজ্ঞানীর মন প্রপঞ্চে জড়িত হইয়া দুঃখ পায় ; আর, স্বল্পকাল ব্রহ্মাভিমুখী হইয়া তৎকালিক সুখ পাইয়া থাকে। যাহাকে জগৎ বলা হয়, উহা বস্তুতঃ চিন্তাই। যদি জগৎ তিরোহিত হয় অর্থাৎ মন চিন্তা রহিত হয় তবে উহা আনন্দ অনুভব করে ; আর যদি জগৎ প্রকাশিত হয় তবে মন দুঃখ অনুভব করে।

ইচ্ছা, সঙ্কল্প, যত্ন ব্যতীত উদীয়মান আদিত্যের সন্নিধিমাত্রে আতসী-কাচ, সূর্য্যকান্তমণি, অগ্নি উদ্‌গীরণ করে, কমল বিকসিত হয়, নীর শুষ্ক হয়, ভূলোকবাসী আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং কর্ম্ম হইতে বিরত হয় ; যেমন অয়স্কান্ত বা চুম্বকলৌহ সমীপে সূচিকা চলায়মান হয়, তেমন সঙ্কল্পরহিত ঈশ্বরের সাক্ষিত্ব মাত্র বশতঃ যে সৃষ্ট্যাদি কৃত্য-ত্রয় অথবা পঞ্চ-কৃত্য সম্পন্ন হইতেছে তদধীন হইয়া জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে চেষ্টা করিয়া পরে নিশ্চেষ্টদশা প্রাপ্ত হয়। পরন্তু, আত্মাতে কোন সঙ্কল্প নাই। লোক-কর্ম্মসমূহ যেমন সূর্য্যকে স্পর্শ করে না, এবং ব্যাপক আকাশকে অন্য চতুর্ভূতের গুণাগুণ সমূহ যেমন স্পর্শ করে না, তদ্রূপ আত্মাকে কোনও কর্ম্ম স্পর্শ করে না।

যে কোন গ্রন্থে মুক্তি লাভের নিমিত্ত মনকে দমন করা আবশ্যক এরূপ উপদিষ্ট হওয়ায়, এবং মনোনিগ্রহই শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত ; এইরূপ অবগত হওয়ার পর, কেবল শাস্ত্র্যাভ্যাসের, কোন প্রয়োজন নাই। মনকে দমন করিবার জন্য 'আমি কে ?'—এরূপ বিচার করাই আবশ্যক, কিন্তু, গ্রন্থ সমূহে বিচার করা যায় কি প্রকারে ? নিজ-আত্মাকে নিজের জ্ঞান চক্ষু

দ্বারাই জানিতে হইবে। নিজেকে রাম বলিয়া জানিতে রামের দর্পণ প্রয়োজন হয় কি ? 'আপনি' পঞ্চকোশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ; আর, গ্রন্থ সমূহ হ'ল পঞ্চকোশের বহির্দ্দেশে স্থিত পদার্থ। অতএব, সমস্ত পঞ্চকোশ বর্জ্জন করিয়া বিচরণীয় 'আপনা'কে গ্রন্থমধ্যে বিচার করাই ব্যর্থ। বন্ধনে স্থিত 'নিজে' কে ?—এরূপ বিচার করিয়া নিজের যথার্থ-স্বরূপ জানাই বস্তুতঃ মুক্তি। সর্ব্বদাই মনকে আত্মাতে স্থাপিত রাখাই আত্ম-বিচার। আর, ধ্যান হলো নিজেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-ভাবে তন্ময় করা। এ ছাড়া, অধিগত বিষয় সমস্তই এককালে বিস্মৃত হইতে হইবে।

যে জঞ্জাল, কুড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে তাহা খুঁজিয়া দেখার যেমন কোন প্রয়োজন নাই, তেমনই, যে নিজের স্বরূপ জানিতে চায়, তার পক্ষে, স্ব-স্বরূপের আবরক তত্ত্বগুলি, একত্র বর্জ্জন করার পরিবর্ত্তে, উহাদের গণনা করা এবং গুণ নিরূপণ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহাকে তো জগৎকে স্বপ্নতুল্য মনে করিতে হইবে।

জাগ্রদবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী, স্বপ্ন স্বল্পকালস্থায়ী, এ ছাড়া অন্য কোন ভেদ নাই। জাগ্রতের ঘটনাবলি যে পরিমাণে সত্য বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নের ঘটনাবলিও স্বপ্নকালে সেই পরিমাণেই সত্য বলিয়া বোধহয়।স্বপ্নে মন অন্য একটি রূপ ধারণ করে। জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন উভয় অবস্থায় মনের বৃত্তি সমূহ এবং বাহিরের নাম-রূপ সমূহ একই কালে আবির্ভূত হয়।

ভাল মন আর মন্দ মন বলিয়া দুইটি মন নাই। বস্তুতঃ মন একটিই। মাত্র বাসনাগুলিই, শুভ এবং অশুভ ভেদে দুই প্রকার। শুভ বাসনাযুক্ত মন ভাল বলিয়া, আর, অশুভ বাসনাযুক্ত মন মন্দ বলিয়া কথিত হয়। অপরে যতই মন্দ বলিয়া প্রতীত হউক না কেন, উহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইবে না। রাগ, দ্বেষ উভয়ই ত্যাগ করিবে। সাংসারিক ব্যাপারে বেশী মন দিবে না। সাধ্যানুসারে অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না।

পরকে দান করিলে নিজেকেই দান করা হয় ভাবিবে। যদি কেবল এই সত্যটির বোধ হয় তবে কেই বা অপরকে দান করিবে না?

অহংকার উদিত হইলে সকল প্রকাশ পাইবে; অহংকার বিলীন হইলে সকল বিলীন হইবে। যে পরিমাণে আমরা বিনম্র ব্যবহার করিব সেই পরিমাণে আমাদের কল্যাণ হইবে। মনকে বশ করিয়া লইলে যে কোন স্থানে থাকিতে পারি।

সম্পূর্ণ

ওঁ শ্রীরমণার্পণমস্তু।

পরিশিষ্ট

আমি কে?

(ভগবান্ শ্রীরমণ মহর্ষির স্বরচিত শ্লোক)।

দেহং মৃন্ময়ব জ্জড়াত্মক মহং বুদ্ধি র্ন তস্যাস্ততো
নাহং তত্তদপেত সুষুপ্তি সময়ে সিদ্ধাত্মা সম্ভাবতঃ।
কোঽহং ভাবযুতঃ কুতো বরধিয়া দৃষ্ট্বাত্মনিষ্ঠাত্মনাং
সোঽহং স্ফূর্ত্তিতয়াঽরুণাচলশিবঃ পূর্ণোবিভাতি স্বয়ম্ ॥

দেহং মৃন্ময়বৎ (দেহ মৃন্ময় ভাণ্ডের ন্যায়) জড়াত্মকং (জড়) অহং-বুদ্ধিঃ তস্য ন অস্তি (উহার অহংবুদ্ধি নাই), অতঃ (অতএব) তৎ (দেহ) অহং ন (আমি বা আত্মা নহে); তদপেত সুষুপ্তি সময়ে (গভীর নিদ্রাকালে দেহবোধ লুপ্ত হইলে) সিদ্ধাত্মনঃ (স্বয়ংসিদ্ধ আত্মার) সম্ভাবতঃ (সত্তা হেতু) (দেহ আমি বা আত্মা নহে)। (তবে) অহংভাবযুতঃ (অহংভাবযুক্ত) কঃ ('আমি' কে?), কুতঃ ('আমি' কোথা হতে?); বরধিয়া (শ্রেষ্ঠ, অগ্র্য বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা) দৃষ্ট্বা (অনুসন্ধান পূর্ব্বক তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া) আত্মনিষ্ঠাত্মনাং (আত্মনিষ্ঠাবান্ দিগের) (হৃদয়ে) সঃ (সেই) অরুণাচলশিবঃ (অরুণগিরি রূপী শিব) অহংস্ফূর্ত্তিতয়া (অহং অহং—এইরূপ অখণ্ড প্রকাশ দ্বারা) স্বয়ং (স্বয়ং প্রকাশরূপে) পূর্ণঃ (পূর্ণস্বরূপে) বিভাতি (প্রকাশমান থাকেন)।

সরলার্থঃ—দেহ মৃন্ময় ঘটের ন্যায় জড় পদার্থ। উহার অহং বুদ্ধি নাই, অতএব উহা 'আমি' নহে। গভীর নিদ্রাকালে যখন এই শরীরের বোধ আমাদের থাকে না, তখনও স্বয়ংসিদ্ধ আত্মার সত্তা হেতু, আত্মার সত্তায় সত্তাবান্ থাকি বলিয়া দেহ আমি নহে। তবে,

আমি কে? আমি কোথা হ'তে?

তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে এই প্রশ্নদ্বয়ের তত্ত্ব অনুসন্ধান পূর্ব্বক উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা আত্মনিষ্ঠা সেবন করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অরুণাচল রূপী শিব "আমি-আমি"—এইরূপ অখণ্ড প্রকাশ দ্বারা স্বয়ংপ্রকাশ পূর্ণস্বরূপে প্রকাশমান থাকেন।

উপদেশ-সার

ভগবান শ্রীরমণ-মহর্ষি বিরচিত

মূল শ্লোক, অন্বয়, পদ্যানুবাদ ও সরলার্থ সহ

শ্রীরমণ আশ্রম

তিরুভন্নমালাই, দক্ষিণ ভারত

উপদেশসারঃ।

কর্ত্তুরাজ্ঞয়া প্রাপ্যতে ফলম্।
কর্ম কিং পরং কর্ম তজ্জড়ম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়। কর্ত্তুঃ (কর্ত্তার) আজ্ঞয়া (ইচ্ছানুসারে) ফলং প্রাপ্যতে (কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়—জীব)। কর্ম কিং পরম (কর্ম্ম কি ঈশ বা স্বতন্ত্র?) কর্ম তৎ জড়ম্ (কর্ম্ম সে তো জড়)।

পদ্যানুবাদ। ঈশ্বরাজ্ঞাধীন কর্ম্ম ফলপ্রসূ হয়।
জড় কর্ম্ম সেই হেতু ঈশ বাচ্য নয় ॥

সরলার্থ।—ফলপ্রদানে কর্ম্মেরই প্রাধান্য—এই মীমাংসক মত খণ্ডন করিবার জন্যই প্রথম শ্লোক। ফল কর্ত্তার, অর্থাৎ কর্ম্মফল বিধাতা ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং কর্ম্ম কি 'পর' অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে, অন্যনিরপেক্ষ হইয়া, নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্মফল প্রদান করিতে সমর্থ? না, তাহা পারে না—ইহা বুঝিতে হইবে। কারণ, কর্ম্ম—সে নিজেই জড় পদার্থ। কর্ম্মের পরত্ব অভাব নিরূপণের নিমিত্ত এখানে কর্ম্মের জড়ত্ব, হেতুরূপে নির্দ্দেশ করা হইল। যে হেতু কর্ম্ম জড় সেই হেতু উহা পর বা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর হইতে পারে না।

কিন্তু যদি বলা যায় কর্ম্মের 'পরত্ব' জ্ঞাপনের জন্য তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন। ফলপ্রদানে কর্ম্মের প্রাধান্যই বাদের বিষয়। কর্ম্ম 'পর' নাই বা হইল; তথাপি ইহা নিজসৃষ্ট অপূর্ব্বদ্বারা ফলপ্রদ হয়। ইহাই প্রমাণভূত বৈদিক বাক্যসমূহের সমন্বয় হইতে পারে।

তদুত্তরে আমরা বলিব—না, ইহা ঠিক নহে। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের স্বর্গসাধকত্বাদি জ্ঞাপক বাক্যের সহিত পরমেশ্বরের শুভাশুভ ফল প্রদানে কর্ম্মসাপেক্ষতার উক্তির ও সমন্বয় করা যায়। উপরন্তু সকলের শুভাশুভ ফল প্রদান করাও জগন্নিয়ামকত্বের অতিরিক্ত আর কিছু নহে। যাহা জগন্নিয়ামক তাহাই 'পর' হইতে পারে। অতএব কর্ম্মবাদীরা দৈব শব্দদ্বারা তজ্জন্য অপূর্ব্ব নির্দেশ করেন ; মহর্ষিও "কর্ম কি পরং" এই বাক্যে অপূর্ব্ব উদ্দেশ করিয়াই উপদেশ করিয়াছেন, যে হেতু ব্যবহারে কর্ম্ম ও অপূর্ব্ব অবিভক্তই থাকে সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ একথা বলিতে ও পারেন না যে তাঁহারা কর্ম্মকে 'পর' বলিতে চান না। ভাবার্থ এই :—মীমাংসক কল্পিত অপূর্ব্ব জড়ত্ব হেতু পর হইতে পারে না। আর শুভাশুভ কর্ম্ম স্বতন্ত্রই ফলদান করিবে ইহাও বলা যায় না। অতএব কর্ম্মফল প্রদানে ঈশ্বর সাপেক্ষতাই স্বীকার করিতে হয়। ইহাতে প্রমাণবাক্যের সহিত বিরোধ হয় না।

কৃতিমহোদধৌ পতনকারণং।
ফলমশাশ্বতং গতিনিরোধকম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়। ফলং (কর্ম্মফল) অশাশ্বতং (অশাশ্বত হওয়ায়) কৃতিমহোদধৌ (কর্ম্মরূপ মহাসমুদ্রে) পতনকারণং (পতনের কারণ) গতি নিরোধকং (পরমগতি নিরোধকারী হয়)।

পদ্যানুবাদ। অশাশ্বত কর্ম্মফল গতি নিরোধক।
করম-সাগরে জীবে নিক্ষেপ কারক ॥

সরলার্থ।—ফল অর্থাৎ কর্ম্মফল অশাশ্বত, যে হেতু ভোগ দ্বারা উহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং 'অনুশয়' মাত্র অবশেষ থাকে বলিয়া পুনরায় জীবের কর্ম্মরূপ মহাসমুদ্রে পতনের কারণ হয়। যদি ফল শাশ্বত অর্থাৎ চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলেও পুনরাবৃত্তি হইত না। কিন্তু

ফল চিরস্থায়ী না হওয়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে বাসনালেশ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়, ইহাই ভাবার্থ। সুতরাং তাহা পুনরাবৃত্তি-রহিত পরমধামে গতি নিরোধ করে। মহর্ষি বলিতেছেন যে অশ্বাশ্বত কর্ম্মফলই পতনের কারণ, কর্ম্ম নহে। সেইজন্য সকাম কর্ম্মই দোষাবহ বলিয়া ভগবান অভিহিত করিতেছেন, এরূপ বুঝিতে হইবে।

ঈশ্বরার্পিতং নেচ্ছয়া কৃতম্।
চিত্তশোধকং মুক্তিসাধকম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়। ঈশ্বরার্পিতং (ঈশ্বরে সমর্পিত) নেচ্ছয়া কৃতং (এবং নিষ্কাম কর্ম্ম) চিত্তশোধকং (চিত্তশুদ্ধিকারক) মুক্তিসাধকং (ও মুক্তি বা মোক্ষপ্রদ হয়)।

পদ্যানুবাদ। হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত।
চিত্তশুদ্ধি অন্তে মুক্তি হইবে সাধিত ॥

সরলার্থ। ঈশ্বরার্পিত অর্থাৎ "হে পরমেশ্বর তুমিই এই কর্ম্মের ফল নিজ ইচ্ছানুসারে জগতের কার্য্যে নিয়োজিত কর"—এই ভাবে সমর্পিত এবং ইচ্ছা বিরহিত বা কামনাবিবর্জ্জিত অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক সংসারবন্ধন বিমোচন করে। মন বিশুদ্ধ হইলেই মোক্ষ সুলভ হয়, ইহাই ভাবার্থ।

কায়বাঙ্মনঃ কার্য্যমুত্তমম্।
পূজনং জপশ্চিন্তনং ক্রমাৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়। কায়বাঙ্মনঃ কার্য্যং (শরীর, বাক্য ও মন এই তিনের কার্য্য) পূজনং জপঃ চিন্তনং (পূজা জপ ও ধ্যান) ক্রমাৎ উত্তমং (যথাক্রমে উত্তম)।

পদ্যানুবাদ। দেহে পূজা, বাক্যে জপ, মনেতে চিন্তন।
ক্রমে শ্রেষ্ঠ এই তিন প্রকার সাধন ॥

সরলার্থ।—দেহ, বাক্য ও মন দ্বারা করা হয় বলিয়া কার্য্য তিন প্রকারে বিভক্ত। দেহদ্বারা পূজা, বাক্য দ্বারা জপ এবং মন দ্বারা

চিন্তা অর্থাৎ ধ্যান—এই তিন প্রকার কর্ম্ম ক্রমান্বয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রথম কর্ম্ম পূজা, তদপেক্ষা জপ উত্তম এবং তাহা অপেক্ষাও ধ্যান শ্রেষ্ঠ। এখানে স্তোত্রাদি পাঠ জপের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

জগত ঈশধীযুক্ত সেবনম্।
অষ্টমূর্ত্তিভৃদ্দেব পূজনম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়। জগতঃ (জগতের) ঈশধীযুক্ত সেবনং (ঈশ্বরবুদ্ধিপূর্ব্বক সেবা) অষ্টমূর্ত্তি-ভৃদ্দেব পূজনং (অষ্টমূর্ত্তিধারী দেবেরই পূজা)।

পদ্যানুবাদ। বিশ্বে পরমেশ বুদ্ধি করিয়া সেবিলে।
অষ্টমূর্ত্তিধারী দেবে পূজাফল মিলে ॥

সরলার্থ।—পূর্ব্ব শ্লোকে 'পূজা' শব্দ দ্বারা সাধারণ বিগ্রহ-পূজা ধরা হইয়াছে। পূজার অপকৃষ্টতা কীর্ত্তন অর্থাৎ পূজাকে সর্ব্ব নিম্ন-স্তরের সাধনরূপে নির্দ্দেশ করা হইতেই তাহা বুঝা যায়। এখন পূজাপ্রসঙ্গে সর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একপ্রকার বিশেষ পূজার কথা বলা হইতেছে। ঈশ্বর-বুদ্ধিতে জগতের সেবাই সেই বিশেষ পূজা। ঈশ্বরই এই জগৎ অর্থাৎ—"এই সকলই ব্রহ্ম, তাহা হইতে জাত, তাহাতে লয়প্রাপ্ত এবং তাহাতেই স্থিত—এই ভাবে প্রশান্ত হইয়া উপাসনা কর"—এই শাণ্ডিল্যবিদ্যোক্ত উপাসনাই এই অষ্টমূর্ত্তিধারী দেবতার পূজা। পঞ্চমহাভূত, সূর্য্য, চন্দ্র এবং জীব—ইঁহারাই ঈশ্বরের অষ্টমূর্ত্তি। এই সকল মূর্ত্তি দ্বারাই সকল জগৎ পরিপূর্ণ, এই জন্য ঈশ্বরবুদ্ধিতে জগতের উপাসনা করায় অর্থাৎ জগতের সর্ব্বত্র অখণ্ড ব্রহ্মত্ব দর্শন করায় এই অষ্টমূর্ত্তি ভগবানের উপাসনাই হয়; ইহাই ভাবার্থ। ইহাই শ্রেষ্ঠ পূজা। এই পূজা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পূজার অন্তর্ভুক্ত নহে; কারণ, উহা সর্ব্ব-নিকৃষ্ট এবং ইহা সর্ব্বোত্তম। একাকার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য বলিয়া ইহা ধ্যানের অন্তর্গত। অষ্টমূর্ত্তির অন্যতম পৃথিবীর ক্ষুদ্র পৃথক্ পৃথক্

প্রদেশে শিবমূর্ত্তি বুদ্ধিতে পূজাই সাধারণ পূজা। তাহা শরীর দ্বারাই করা হয়। পরন্তু এই পূজা সমগ্র অষ্টমূর্ত্তির ঐক্য করিয়া বুদ্ধিদ্বারা কৃত হয়। এই দুই প্রকারের পূজায় ইহাই প্রভূত পার্থক্য।

উত্তমস্তবাতুচ্চ মন্দতঃ।
চিত্তজং জপধ্যান মুত্তমম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়। উত্তমস্তবাৎ (ঈশ্বরোদ্দেশ্যে বৈদিক বা আর্ষ স্তবাদি হইতে) উচ্চ মন্দতঃ (এবং উচ্চ ও উপাংশু জপ অপেক্ষাও) চিত্তজং জপধ্যানং উত্তমম্ (মানসিক জপ বা ধ্যান উত্তম)।

পদ্যানুবাদ। স্তবাপেক্ষা উচ্চ জপ মৃদু আরো ইষ্ট।
তদপেক্ষা হৃদি জপ ধ্যান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সরলার্থ।—বৈদিক বা মুনিঋষি রচিত উত্তম ভাবপূর্ণ স্তবাদি অপেক্ষা উচ্চ জপ উত্তম। উচ্চ অপেক্ষা উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ। তাহা অপেক্ষাও মানসিক জপ উত্তম। মানসিক জপই ধ্যান—উভয়ে পার্থক্য নাই। ইহারা পর পর শ্রেষ্ঠ।

আজ্যধারয়া স্রোতসা সমম্।
সরলচিন্তনং বিরলতঃ পরম্ ॥৭॥

অন্বয়। আজ্যধারয়া (ঘৃতের ধারার মত) স্রোতসা সমং (নদীর প্রবাহের মত) সরল চিন্তনং (অবিরাম সহজ চিন্তাধারা) বিরলতঃ পরম্ (বিচ্ছিন্ন চিন্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ)।

পদ্যানুবাদ। স্রোতের মতন ধ্যান তৈলধারা প্রায়।
বিক্ষেপ রহিত হলে শ্রেষ্ঠ বলা যায়॥

সরলার্থ।—ঘৃতের বা তৈলের ধারার এবং নদীস্রোতের মত অবিরাম সহজ ধ্যান মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন চিন্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যান

উত্তম হইলেও, তন্মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধ্যান বিচ্ছিন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধ্যানে ভক্তিরূপ স্নেহ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য ঘৃতধারার সহিত এবং নৈর্ম্মল্য বুঝাইবার জন্য স্রোতের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।

ভেদভাবনাৎ সোঽহমিত্যসৌ।
ভাবনাঽভিদা পাবনী মতা ॥৮॥

অন্বয়। ভেদভাবনাৎ (ভেদভাবনা হইতে) সোঽহমিত্যসৌ অসৌ স অহম্ ইতি (সেই তিনিই আমি, এই প্রকার) অভিদা ভাবনা (অভেদ ভাবনা, ভেদবিরহিত ধ্যান) পাবনী মতা (অধিক পবিত্রতাদায়ক বলিয়া গণ্য হয়)।

পদ্যানুবাদ। 'আমি' 'তুমি' পৃথক্ ভাব ভেদেতে চিন্তন।
তদপেক্ষা সোঽহং ভাব অধিক পাবন ॥

সরলার্থ।—এখন আবার ধ্যানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বলিতেছেন। ভেদভাবনা অর্থাৎ ধ্যানকালে ধ্যেয় পরমেশ্বরকে নিজ হইতে পৃথক কল্পনা করিয়া যে ধ্যান করা হয়, তদপেক্ষা 'সেই ইন্দ্রিয়াতীত অনাম তিনি অর্থাৎ ঈশ্বরই আমি—সোঽহং', এই প্রকার অভেদ ভাবনা পূর্ব্বক ধ্যান অধিক পবিত্রতাসম্পাদক বলিয়া পরিগণিত হয়। ভেদ বা দ্বৈত ধ্যান অপেক্ষা অভেদ বা অদ্বৈত ধ্যান উত্তম।

ভাবশূন্য সদ্ভাব সুস্থিতিঃ।
ভাবনা বলাদ্ভক্তি রুত্তমা ॥৯॥

অন্বয়। ভাবনাবলাৎ (অভেদ ভাবনা বলে প্রাপ্ত) ভাবশূন্য সদ্ভাব সুস্থিতিঃ (সঙ্কল্পশূন্য ভাবে সত্তামাত্রে নিষ্ঠা) উত্তমা ভক্তিঃ (উত্তমা ভক্তি, শ্রেষ্ঠা ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি) বলিয়া উক্ত হয়।

পদ্যানুবাদ। সংকল্প রহিত সৎ-ভাবে স্থিতি হ'লে।
ভাবনা বলেতে প্রাপ্ত শুদ্ধা ভক্তি বলে ॥

সরলার্থ।—অভেদ ভাবনার ফলে যখন মন সংকল্পশূন্য হইয়া

সদ্বস্তুতে অর্থাৎ সতের ভাব বা সত্তামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া স্থিতি লাভ করে তখন সেই অবস্থাকেই উত্তমা বা শুদ্ধাভক্তি বলা বলা হয়। পৃথক ভাবনায় যে ভক্তি তাহা অধম বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

হৃৎস্থলে মনঃ স্বস্থতা ক্রিয়া।
ভক্তিযোগ বোধাশ্চ নিশ্চিতম্ ॥১০॥

অন্বয়। হৃৎস্থলে (আত্মার স্বস্থান বা মনের উৎপত্তি স্থান হৃদয়ে) মনঃ স্বস্থতা (মনের স্ব-রূপে স্থিতি) (সম্যক্) ক্রিয়া ভক্তি যোগ বোধাশ্চ (কর্ম্ম ভক্তি যোগ ও জ্ঞানের পূর্ণতা) নিশ্চিতং (নিঃসন্দেহ)।

পদ্যানুবাদ। হৃদি স্থলে মনের যে স্ব-স্থান স্থিততা।
কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞান সবের পূর্ণতা ॥

সরলার্থ। হৃদয় হইতেই মনের উৎপত্তি। সেই নিজস্থানে মনের নিশ্চল স্থিতি হইলে কর্ম্ম ভক্তি যোগ জ্ঞান সকল মার্গের চরম অবস্থা হয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বায়ুরোধনা ল্লীয়তে মনঃ।
জালপক্ষীবদ্ রোধসাধনম্ ॥১১॥

অন্বয়। বায়ুরোধনাৎ (বায়ুরোধ করা হইলে অর্থাৎ কুম্ভকসাহায্যে) মনঃ জাল-পক্ষীবৎ (মন জালবদ্ধ পক্ষীর মত) লীয়তে (লয় পায় অর্থাৎ নিশ্চল হয়) (ইদং) রোধসাধনম্ (ইহা মন নিরোধের সাধন বিশেষ)।

পদ্যানুবাদ। পাশ দ্বারা পক্ষী যথা বদ্ধ করা যায়।
প্রাণবায়ু রোধে তথা মন রুদ্ধ হয় ॥

সরলার্থ।—প্রাণবায়ু প্রতিষ্টম্ভন বা নিয়মন দ্বারা পাশবদ্ধ পক্ষীর মত মনকে আত্মায় নিশ্চল করা যায়। ইহাই রোধসাধন। প্রযত্ন সহকারে কুম্ভকযোগে প্রাণবায়ু রোধ করা যায়—ইহা প্রতিষ্টম্ভন।

সর্ব্বদা প্রাণবায়ুর যাতায়ত প্রত্যবেক্ষণ করিলেও প্রাণবায়ু স্বতঃই রোধ হয়—ইহা নিয়মন। রাজযোগীদের মতের অবিরুদ্ধে ইহাকে কুম্ভক সংজ্ঞা দেওয়া হয়। শেষোক্ত নিয়মনই মহর্ষির অভিপ্রেত প্রক্রিয়া যেহেতু শ্রীরমণ গীতায় উক্ত হইয়াছে :—

প্রাণরোধশ্চ মনসা প্রাণস্য প্রত্যবেক্ষণম্।
কুম্ভকং সিদ্ধতি হ্যেবং সততং প্রত্যবেক্ষণাৎ॥

অর্থাৎ মন দ্বারা প্রাণের প্রতি দৃষ্টি রাখাও প্রাণরোধ (বা প্রাণ রোধের উপায়)। এইভাবে সর্ব্বদা প্রাণ প্রত্যবেক্ষণ করিলেও কুম্ভক সিদ্ধ হয়।

চিত্তবায়বশ্চিৎ ক্রিয়াযুতাঃ।
শাখয়োর্দ্বয়ী শক্তিমূলকা ॥১২॥

অন্বয়। চিৎক্রিয়াযুতাঃ (জ্ঞান ও ক্রিয়াযুক্ত) চিত্তবায়বঃ চিত্ত ও প্রাণ) শক্তিমূলকা ঈশ্বরশক্তি হইতে উৎপন্ন) শাখয়োঃ দ্বয়ী (শাখাদ্বয়)।

পদ্যানুবাদ। চিত্তের চিন্তন, ক্রিয়া প্রাণের প্রকাশ।
উভয়ই এক মূলশক্তির বিকাশ॥

সরলার্থ।—যথাক্রমে চিন্তা ও ক্রিয়াযুক্ত মন ও প্রাণ ঈশ্বরের মূল-শক্তির দুইটি শাখা—জ্ঞানশক্তিরূপ শাখা চিত্ত এবং ক্রিয়াশক্তিরূপ শাখা প্রাণ। যেহেতু মন ও বায়ু একই ঈশ্বরশক্তির দুইটি শাখা, অতএব এই উভয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার পথ হওয়ার যোগ্য।

লয়বিনাশনে উভয় রোধনে।
লয়গতং পুনর্ভবতি নো মৃতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়। লয়বিনাশনে (লয় ও বিনাশ) উভয় রোধনে (উভয় প্রকার রোধ)। লয়গতং (লয়প্রাপ্ত হইলে) পুনর্ভবতি (পুনরায় জন্মে) মৃতং নো (বিনাশপ্রাপ্ত হইলে আর জন্মে না)।

পদ্যানুবাদ। দ্বিবিধ রোধন আছে, বিনাশ ও লয়।
লয়ে পুনঃ জন্মে, কিন্তু নাশে নাহি হয়॥

সরলার্থ।—লয় ও বিনাশ এই দুই প্রকার নিরোধ আছে। লয়প্রাপ্ত মন পুনরায় উৎপন্ন হয় কিন্তু মন নাশপ্রাপ্ত হইলে আর জন্মে না। কেবলমাত্র মনের বৃত্তিসমূহের উপসংহার হইলে 'লয়' বলা হয়। যে সকল যোগী 'লয়' অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাহাদের উত্থান ও সমাধি এই দুই অবস্থাই পর্য্যায়ক্রমে হয়। বৃত্তিসমূহের মূল যে অহংকার তাহা উপসংহৃত হইলে 'মনোনাশ' হয়। মনোনাশপ্রাপ্ত জ্ঞানী চিরসমাহিত অর্থাৎ কি সমাধি কি অসমাধি সর্ব্বদাই তিনি সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করেন।

প্রাণবন্ধনা ল্লীনমানসম্।
একচিন্তনা ন্নাশমেত্যদঃ॥ ১৪॥

অন্বয়। প্রাণবন্ধনাৎ (প্রাণরোধ হইতে) লীনমানসং (লয়প্রাপ্ত যে মন) অদঃ (উহা) একচিন্তনাৎ (একচিন্তা হইতে) নাশম্ এতি (নাশ প্রাপ্ত হয়)।

পদ্যানুবাদ। প্রাণরোধ দ্বারা মন লয়প্রাপ্ত হয়।
এক চিন্তা হ'তে তার নাশ উপজয়॥

সরলার্থ।—প্রাণবায়ুর প্রতিষ্টম্ভন বা নিয়মন দ্বারা মন 'লয়' প্রাপ্ত হয় এবং উহা অর্থাৎ সেই মনই আত্মার ঐক্য চিন্তা দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। প্রাণরোধে মনোলয় হয়, মনোনাশ হয় না। তদনন্তর আত্মৈক্যানুসন্ধান করিলে মনের নাশ হয়।

নষ্টমানসোৎকৃষ্টযোগিনঃ।
কৃত্যমস্তি কিং স্বস্থিতিং যতঃ॥ ১৫॥

অন্বয়। স্বস্থিতিং যতঃ (আত্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত) নষ্টমানস উৎকৃষ্ট যোগিনঃ (মনোনাশ-প্রাপ্ত যোগিবরের) কিং কৃত্যমস্তি (কি কর্ত্তব্য আছে?)।

পদ্যানুবাদ। নষ্টমনা যোগিবর আত্মসংস্থ হয়।
কি কর্ত্তব্য এ ধরায় তাঁর তরে রয়?॥

সরলার্থ।—আত্মায় যাঁহার স্থিতি হইয়াছে এই প্রকার মনোনাশ-প্রাপ্ত উৎকৃষ্ট যোগিরাজের কি কিছু করণীয় থাকিতে পারে? মন নাশপ্রাপ্ত হইলে কোন কর্ত্তব্যই অবশেষ থাকে না—ইহাই ভাবার্থ।

দৃশ্যবারিতং চিত্তমাত্মনঃ।
চিত্তদর্শনং তত্ত্বদর্শনম্॥ ১৬॥

অন্বয়। দৃশ্যবারিতং চিত্তং (দৃশ্যনিবারিত অর্থাৎ অন্তর্মুখ মন) আত্মনঃ চিত্তদর্শনং (নিজের চিত্তদর্শন) (তদেব) তত্ত্বদর্শনং (তাহাই তত্ত্বদর্শন)।

পদ্যানুবাদ। দৃশ্য শূন্য নিজ চিত্ত যবে মাত্র রয়।
তাহা ভিন্ন তত্ত্বদৃষ্টি আর কিছু নয়॥

সরলার্থ।—যখন নিজের চিত্ত দৃশ্যশূন্য হয় অর্থাৎ মন যখন অন্তর্মুখ হইয়া বিষয় গ্রহণে নিবৃত্ত হয়, তখন কেবল চিত্ত অবশিষ্ট থাকে,—চিত্তে কোন দৃশ্য থাকে না, নিদ্রাও থাকে না,—তাহাই প্রকৃত চিত্তদর্শন। আর এইরূপ চিত্তদর্শনকেই তত্ত্বদর্শন বলা হয়।

মানসং তু কিং মার্গণেকৃতে।
নৈব মানসং মার্গ আর্জবাৎ॥১৭॥

অন্বয়। মানসং তু কিং (মনই বা কি বস্তু) (ইতি) মার্গণে কৃতে (এই বিচার করিলে) ন এব মানসং (দৃশ্যতে) মনই দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ মন বলিয়া কোন বস্তু পাওয়া যায় না)। (অয়মেব) আর্জবাৎ মার্গঃ (ইহাই সরলতাহেতু প্রকৃষ্ট পথ)।

পদ্যানুবাদ। মনের স্বরূপ তরে সন্ধান করিলে।
মন বস্তু নাহি রয় ঋজু দৃষ্টি বলে॥

সরলার্থ।—মনই বা কি বস্তু—নিরন্তর অপ্রমত্ত হইয়া এই বিচার

করিলে, মনকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তাহার কোন পৃথক অস্তিত্ব বোধ করা যায় না। বিচার কর্ত্তা নিজেই মনের স্বরূপ, কারণ মন নিজ-রশ্মি বিশেষ। বিচার সময়ে সেই রশ্মি আত্মায় উপসংহৃত হওয়ায় মন দৃষ্ট হয় না—ইহাই ভগবান মহর্ষি উপদেশ করিতেছেন। ইহাই সরলতা হেতু আত্মোপলব্ধির প্রকৃত মার্গ বা পথ।

বৃত্তয়স্ত্বহং বৃত্তি মাশ্রিতাঃ।
বৃত্তয়ো মনো বিদ্ধ্যহং মনঃ ॥১৮॥

অন্বয়। বৃত্তয়ঃ (মনোবৃত্তিগুলি) তু অহংবৃত্তিম আশ্রিতাঃ ('অহং' এই প্রকার সংকল্প মূলক বটে) বৃত্তয়ঃ মনঃ (বৃত্তিসমষ্টিই মন) মনঃ অহং বিদ্ধি (মনকে অহংকার বলিয়াই জানিও)।

পদ্যানুবাদ। বৃত্তির সমষ্টি মন 'অহং'বৃত্তি মূলে।
অতএব 'অহং'কেই জেনো মন বলে॥

সরলার্থ।—মনোবৃত্তিগুলি অহং এই প্রকার সংকল্প আশ্রয় করিয়াই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ অহংবৃত্তিই তাহাদের মূল বা প্রকৃতি। অহংবৃত্তির সংস্থতি অর্থাৎ গতি বা বিজৃম্ভণ অর্থাৎ প্রকাশ কালে মনোবৃত্তিগুলিই মন বলিয়া উক্ত হয়। সুতরাং মনকে অহং বলিয়া জানিও। অর্থাৎ অহংকেই প্রকৃত মন বলা হয়। যে হেতু বৃত্তিসমূহ অহংবৃত্তির আশ্রিত সুতরাং তাহারা বস্তুতঃ তদ্রূপ অর্থাৎ অহংরূপই—অতএব মন তাহার প্রকৃতিগত অহংবৃত্তিরূপে পর্য্যবসিত হয়; ইহাই তাৎপর্য্য।

অহময়ংকুতো ভবতি চিন্বতঃ।
অয়ি পতত্যহং নিজ বিচারণম্ ॥১৯॥

অন্বয়। অয়ং অহং (এই অহংকার) কুতঃ ভবতি (কোনস্থান হইতে উৎপন্ন হইচ) (ইতি) চিন্বতঃ (এইরূপ বিচার করিতে করিতে সেই বিচার কর্ত্তার) অয়ি

(শিষ্য) (হে শিষ্য) অহং পততি (অহংকারও নাশপ্রাপ্ত হয়) (ইদং) নিজ-বিচারণম্ (ইহাই নিজবিচার বা আত্মবিচার)।

পদ্যানুবাদ। এই অহং কোথা হ'তে হইল উদ্ভূত।
ঈদৃশ বিচারে তাহা নয় নিরাকৃত॥

সরলার্থ।—অহংবৃত্তিরূপ এই অহংকার কোন স্থান হইতে উৎপন্ন হইল এরূপ চিন্তা বা বিচার করিলে অহংকার নাশপ্রাপ্ত হয়। বিচার-কর্ত্তা অহংভাব স্বয়ংই অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহাই আত্মবিচার।

অহমি নাশভাজ্যহমহং তয়া।
স্ফুরতি হৃৎ স্বয়ং পরমপূর্ণসৎ॥২০॥

অন্বয়। অহমি নাশভাজি (সতি) (মনোবৃত্তিমূল অহংকার বিনাশ প্রাপ্ত হইলে) পরম পূর্ণসৎ (পরম অখণ্ড সদ্বস্তু) হৃৎ (স্বরূপ) স্বয়ং অহমহং তয়া (নিজে 'আমি' 'আমি' এই ভাবে) স্ফুরতি (স্ফুরিত হয়)।

পদ্যানুবাদ। মনোবৃত্তি-মূল অহংকারের বিনাশে।
পূর্ণ সত্য 'আমি' 'আমি' হৃদয়েতে ভাসে॥

সরলার্থ।—মনোবৃত্তি সমূহের মূল অহংকার বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পরম অখণ্ড এবং সদ্রূপ হৃৎ অর্থাৎ স্বরূপ বা আত্মা 'আমি' 'আমি' এই প্রকারে ভাসমান হয়। এখন প্রশ্ন এই যে অহং নাশ পাইলে, পুনরায় অন্য 'আমি' ভাব কোথা হইতে আসিবে? তদুত্তরে বলা হচ্ছে:—অহংতা বা অহংভাব ব্যক্তিত্ব ভিন্ন অপর কিছু নহে। তাহা দুই প্রকার—মনোগত এবং আত্মগত। মনোগত অহংভাব থাকায় আত্মগত অহংভাব প্রকাশ পায় না। পরন্তু মনোগত অহংভাবের উপরতি হইলে আত্মগত অহং প্রস্ফুটিত হয়। তাই বলা হচ্ছে—এক 'অহং' এর নাশে অন্য অহং 'আমি' 'আমি' এই ভাবে স্ফুরিত হয়। এই অহং অখণ্ড এবং স্ব-প্রকাশ।

ইদমহং পদাভিখ্যমন্বহম্ ।
অহমি লীনকেঽপ্য লয়সত্তয়া ॥২১॥

অন্বয় । অহমি লীনকেঽপি ('অহং' লয়প্রাপ্ত হইলেও) অলয়সত্তয়া (সত্তার লোপ না হওয়ায়) ইদং (এই হৃৎ বা স্বরূপ) অন্বহং (সর্ব্বদা) অহংপদাভিখ্যম্ (অহং পদের মুখ্য অর্থ)।

পদ্যানুবাদ। অহং লয়ান্তেও 'আমি' লয় নাহি পায়।
তাই উহা চিরন্তন অহংবাচ্য হয় ॥

সরলার্থ।—এই স্বরূপই অহংপদের প্রকৃত এবং শাশ্বত অর্থ। মনোগত অহং গৌণ এবং অনিত্য অর্থ। যেমন, সুষুপ্তিকালে যখন মনোগত অহংকার থাকে না, এই মুখ্য নিত্য 'অহং' এর সত্তা নষ্ট হয় না। এই অহং পদার্থই আত্মা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অহঙ্কার শান্ত হইয়া গেলেও আত্মা স্ফুরিত হইতে থাকে। কিন্তু মন শান্ত হইয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইল যে অহংপদ মনে গৌণ এবং আত্মায় মুখ্য। অর্থাৎ মনের সহিত বিনাশশীল অনিত্য অহংকারের সম্বন্ধ হেতু তাহা গৌণ মাত্র, কিন্তু আত্মায় সত্তারূপে অহন্তা নিত্য বিরাজমান বলিয়া তাহা মুখ্য।

বিগ্রহেন্দ্রিয় প্রাণধীতমঃ।
নাহমেকসৎ তজ্জড়ং হ্যসৎ ॥২২॥

অন্বয়। অহম্ একসৎ (একমাত্র সদ্বস্তু আমি) বিগ্রহ ইন্দ্রিয় প্রাণধী (রূপং) তমঃ ন (দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধিরূপ তিমির, অজ্ঞান বা অবিদ্যা নহি) (যস্মাৎ) (যে হেতু) তৎ (তাহা অর্থাৎ বিগ্রহাদি) জড়ং হি অসৎ (চ) (জড় এবং অনিত্য বা মিথ্যা, ইহাতে সংশয় নাই)।

পদ্যানুবাদ। দেহেন্দ্রিয় প্রাণ বুদ্ধি তম আমি নই।
জড় মিথ্যা সব, নাহি সৎ আমি বই ॥

সরলার্থ।—একমাত্র সদ্বস্তু 'আমি' দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান নহি, কারণ তাহারা জড় এবং অনিত্য পদার্থ। যাহা জড় তাহা কিরূপে আত্মা হইতে পারে? যাহা থাকে না তাহাই বা আত্মা হয় কেমন করিয়া?

সত্ত্বভাসিকা চিৎক্ববেতরা।
সত্তয়া হি চিচ্চিত্তয়া হ্যহম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়। সত্ত্বভাসিকা (সদ্বস্তু প্রকাশক) ইতরা চিৎ ক্ব বা? (অন্য চিৎ আবার কোথায়?) সত্তয়া হি চিৎ (যেহেতু সত্তা দ্বারাই চিৎ হয়) চিত্তয়া হি অহং (এবং চিত্তা [চিত্তের ভাব] দ্বারাই 'আমি' হয়)।

পদ্যানুবাদ। অন্য কিবা আছে চিৎ, সত্তা প্রকাশক।
সত্তা হেতু চিৎ তাহা, চিৎ আমি এক ॥

সরলার্থ।—সদ্বস্তুই বা কোন বস্তু দ্বারা প্রকাশিত হয়?—এরূপ আশঙ্কা নিবারণ করিতেছেন। সদ্বস্তু প্রকাশক অন্য চিৎ আবার কোথায়? অর্থাৎ তাহা নাই। সত্তাকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য পৃথক কোন চিদ্বস্তু থাকা সম্ভব নয়। কারণ, এই 'সত্তা' দ্বারাই চিৎ হয়—অর্থাৎ যাহা সৎ তাহাই স্বভাবতঃ চিন্ময়। আবার, 'চিত্তা' দ্বারাই চিৎস্বরূপ 'আমি' বিরাজমান থাকি। যাহা চিৎ তাহাই স্বভাবতঃ অহং পদার্থ। সৎ, চিৎ ও অহং এই তিনটি স্বভাবতঃ একই পদার্থ। তবে মনের যে 'অহংতা' তাহা চিৎরশ্মি সম্বন্ধ হেতু গৌণ, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

ঈশজীবয়ো র্বেষধীভিদা।
সৎস্বভাবতো বস্তু কেবলম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়। ঈশজীবয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের) বেষধীভিদা (ভবতি) (বেশ বা

উপাধি এবং বুদ্ধি বা জ্ঞান জনিত পার্থক্য হইয়া থাকে) সত্তস্বভাবতো বস্তুকেবলম্ (সত্তারূপ স্বাভাবিক ধর্ম্মে তাহারা একই বস্তু)।

পদ্যানুবাদ। জীবেশ্বরে আছে জ্ঞান উপাধির ভেদ।
সত্তারূপ ধর্ম্মে কিন্তু তাহারা অভেদ ॥

সরলার্থ।—ঈশ্বর ও জীবের পার্থক্য উপাধি এবং জ্ঞানের ভেদ নিবন্ধন দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার উপাধি ব্রহ্মাণ্ড, আর জীব অল্পজ্ঞ এবং পিণ্ড বা দেহধারী। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বস্তুতঃ তাঁহারা একই, কারণ উভয়েরই স্বভাব সত্তারূপ ধর্ম্ম। যাহা তিন-কালে বর্ত্তমান থাকে তাহাকে সৎ বলে। অন্যান্য বিনশ্বর পদার্থ ভাণকালীন সত্তা আশ্রয় করিয়া সৎ এর ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র।

বেষহানতঃ স্বাত্মদর্শনম্।
ঈশদর্শনং স্বাত্মরূপতঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়। বেষহনতঃ (উপাধির সহিত সম্বন্ধ ভাবনা নিরস্ত হইলে) স্বাত্মদর্শনং (নিজ আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়)। স্বাত্মরূপঃ (স্বকীয় আত্মারূপে) (তদেব) ঈশদর্শনম্ (তাহাই ঈশ্বরদর্শন)।

পদ্যানুবাদ। উপাধির বাধে হয় দর্শন আত্মার।
ঈশ্বর দর্শন তাহা 'স্ব'রূপে আমার ॥

সরলার্থ।—উপাধি অর্থাৎ দেহে অহম্ভাবনা বা দেহাত্মবুদ্ধি নিরাকৃত হইলে, নিজ আত্মার দর্শন হয় অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হয়। হউক্ আত্ম-দর্শন, ঈশ্বরদর্শন কেমন করিয়া হয়? যদি এরূপ প্রশ্ন হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—নিজের 'স্ব'রূপে, নিজের আত্মারূপে। ঈশ্বরই আত্মার যথার্থ রূপ, সুতরাং আত্মদর্শনই ঈশ্বরদর্শন। বিশুদ্ধ আত্মসাক্ষাৎকারের অতিরিক্ত ঈশ্বরদর্শন বলিয়া অপর কিছু নাই। উপাধিবিহীন আত্মার

অপরিচ্ছিন্নতা নিবন্ধন আত্মানুভূতিতে পরিচ্ছিন্নতা থাকে না বরং সেই দর্শন পূর্ণ দর্শনই হয়।

আত্মসংস্থিতিঃ স্বাত্মদর্শনম্ ।
আত্মনির্দ্বয়া দাত্মনিষ্ঠতা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়। আত্মসংস্থিতিঃ (এব) (আত্মাতে স্থিতিই) স্বাত্মদর্শনং (নিজ আত্মদর্শন)। (সা) আত্মনিষ্ঠতা আত্মনির্দ্বয়াৎ ভবতি (সেই আত্মনিষ্ঠতা আত্মায় দ্বৈতাভাব নিবন্ধনই হয়)।

পদ্যানুবাদ। আত্মাতে সংস্থিতি হয় দর্শন তাঁহার।
অদ্বয়তা হেতু তাই নিষ্ঠতা আত্মার ॥

সরলার্থ।—পূর্ব্বশ্লোকে 'দর্শন' শব্দ থাকায় পাছে ত্রিপুটী (অর্থাৎ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য) সম্ভাবনা হয়, এরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহা পরিহার করিতেছেন। আত্মসংস্থিতি বা আত্মনিষ্ঠাই আত্মদর্শন—এখানে ত্রিপুটীর স্থান নাই। এই আত্মনিষ্ঠা আত্মায় অদ্বয়তা হেতুই হয়। আত্মনিষ্ঠায় দ্বৈতসম্পর্কের লেশও থাকা সম্ভব নয়। যদি দ্বৈতই ভাসে তবে তন্ময়নিষ্ঠা কেমন করিয়া হইতে পারে?—ইহাই তাৎপর্য্য।

জ্ঞানবর্জিতাঽজ্ঞানহীন চিৎ।
জ্ঞানমস্তি কিং জ্ঞাতুমন্তরম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়। জ্ঞানবর্জ্জিতা (জ্ঞানশূন্য) অজ্ঞানহীনা (অজ্ঞানশূন্য) চিৎ (চিন্মাত্র) জ্ঞানং ভবতি) (প্রকৃত জ্ঞান বা জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ বলিয়া গণ্য হয়)। জ্ঞাতুং (কোনও কিছু জানিবার জন্য) অন্তরং (অবকাশ, ভেদ বা অবসর) অস্তি কিম্ (আছে কি?)।

পদ্যানুবাদ। জ্ঞানাজ্ঞান বিবর্জ্জিত চিৎ বিরাজিছে।
জানিবার অন্য বস্তু আর কিবা আছে? ॥

সরলার্থ।—বৈষয়িক জ্ঞানশূন্য এবং অজ্ঞানশূন্য চিৎই জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ। যদি প্রশ্ন হয়, জ্ঞানে জ্ঞানবিবর্জ্জিতত্ব কিরূপে সম্ভব? তাই,

কারণ দেওয়া হচ্ছে। জানিবার অন্য পৃথক বস্তু না থাকায় জ্ঞানস্বরূপ চিৎকে জ্ঞানশূন্য বলা হইয়াছে। সেখানে স্থিতি হইলে ভেদের অভাব নিবন্ধন ভেদের আশ্রয় লইয়া যে লোকপ্রসিদ্ধ বৈষয়িক জ্ঞান হইয়া থাকে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হয়। তথাপি এই স্থিতি জ্ঞানময়ী কারণ তাহা পূর্ণানুভূতিরূপা।

কিং স্বরূপমিত্যাত্মদর্শনে।
অব্যয়াঽভবাঽঽপূর্ণচিৎ সুখম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়। কিং (মে) স্বরূপং (আমার স্বরূপ কি?) ইতি আত্মদর্শনে (এই প্রকার বিচার দ্বারা আত্মদর্শন হইলে) অব্যয়া (নাশরহিত, অপরিবর্ত্তনীয়) অভবা (অজ, অকৃত্রিম বা সহজ) আপূর্ণ চিৎসুখং (সম্পদ্যতে) (পরিপূর্ণ চিদানন্দ পদ লব্ধ হয়)।

পদ্যানুবাদ। স্বরূপ সন্ধানে যদি আত্মদৃষ্টি হয়।
পূর্ণ চিদানন্দ তাহা অজ ও অব্যয় ॥

সরলার্থ।—নিজের যথার্থ স্বরূপ কি তাহা অনুসন্ধান করিতে করিতে আত্মসাক্ষাৎকার হইলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপ অবিনাশী ও অকৃত্রিম অহেয়-অনুপাদেয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি হয়।

বন্ধমুক্ত্যতীতং পরং সুখম্।
বিন্দতীহ জীবস্তু দৈবিকঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। দৈবিকঃ জীবঃ তু (দিব্যত্বপ্রাপ্ত জীব কিন্তু) বন্ধমুক্ত্যতীতং (বন্ধ ও মুক্তির অতীত) পরং সুখং (পরমানন্দ) ইহ (ইহজগতেই) বিন্দতি (প্রাপ্ত হয়)।

পদ্যানুবাদ। মুক্তিবন্ধাতীত এই চিদানন্দরূপ।
জীব হেথা লভিছেন ঈশ্বর স্বরূপ ॥

সরলার্থ।—দেহাত্মভাবরহিত দিব্যত্ব প্রাপ্ত জীব, তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইহজগতেই বন্ধ এবং মুক্তির অতীত

পরমানন্দ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ তাহাতে স্থিতিলাভ করেন। মুক্তি বন্ধন-সাপেক্ষ, সুতরাং বন্ধনদশাগ্রস্ত অজ্ঞানী জীবের পক্ষেই মুক্তি। কিন্তু বন্ধস্ফূর্ত্তিরহিত জ্ঞানীর পক্ষে মুক্তিস্ফূর্ত্তিও নাই। তাঁর সেই অবস্থাকে বন্ধ ও মুক্তির অতীত অবস্থাই বলিতে হইবে।

অহমপেতকং নিজবিভানকম্।
মহদিদং তপো রমণ বাগিয়ম্ ॥৩০॥

অন্বয়। অহমা অপেতকং (মনোমূল অহংকার দ্বারা বিযুক্ত) নিজবিভানকং (নিজস্বরূপের প্রকাশ) ইদং মহৎ তপঃ (ইহা শ্রেষ্ঠ তপস্যা); ইয়ং রমণবাক্ (ইহা মহর্ষি রমণের বাক্য)।

পদ্যানুবাদ। অহংকার বিনাশিত নিজে প্রকাশিত।
মহাতপ হয় ইহা রমণ-কথিত ॥

সরলার্থ।—অনাত্মারূপ মনোমূল অহংকার অপগত বা বিনষ্ট হইলে যে নিজ স্বরূপের ভাণ অর্থাৎ প্রকাশ তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা। নিত্য আত্মস্ফুরণ হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য কোন তপস্যা নাই। ইহা—অর্থাৎ এই ইহাই শ্রীরমণ মহর্ষির বাক্য বা উপদেশ। ইহাই ত্রিশটি শ্লোকে গ্রথিত "উপদেশসার"। ওম্।

শ্রীরমণ মহর্ষি বিরচিতং

শ্রীঅরুণাচল পঞ্চরত্ন স্তোত্রম্।

করুণাপূর্ণ সুধাব্ধে
কবলিতঘনবিশ্বরূপ কিরণাবল্যা॥
অরুণাচল পরমাত্মন্
অরুণো ভব চিত্তকঞ্জসুবিকাসায়॥
তয্যরুণাচল সর্বং
ভূত্বা স্থিত্বা প্রলীনমেতচ্চিত্রম্।
হৃদ্যহমিত্যাত্মতয়া
নৃত্যসি ভোস্তে বদন্তি হৃদয়ং নাম॥ ২ ॥
অহমিতি কুত আয়াতী
ত্যন্বিষ্যান্তঃ প্রবিষ্টয়াহত্যমলধিয়া।
অবগম্য স্বং রূপং
শাম্যত্যরুণাচল ত্বয়ি নদীবাব্ধৌ॥ ৩
ত্যক্ত্বা বিষয়ং বাহ্যং
রুদ্ধপ্রাণেন রুদ্ধমনসাহন্তস্ত্বাম্।
ধ্যায়ন্ পশ্যতি যোগী
দোধিতিমরুণাচল ত্বয়ি মহীয়ং তে॥ ৪ ॥
ত্বয্যর্পিতমনসা ত্বাং
পশ্যন্ সর্বং তবাকৃতিতয়া সততম্।
ভজতেহনন্যপ্রীত্যা
স জয়ত্যরুণাচল ত্বয়ি সুখে মগ্ন॥ ৫ ॥
শ্রীমদ্রমণ মহর্ষের্দর্শনমরুণাচলস্য দেবগিরা।
পঞ্চকমার্যোগীতৌ রত্নং ত্বিদমৌপনিষদং হি

আত্মানুসন্ধান

ভূমিকা

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষি

১৯০১ সালে

যখন মৌনব্রত যাপন করছিলেন সেইসময়

তাঁর শিষ্য

গম্ভীরম শেষায়-এর জন্য

এই উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ

উপদেশাবলীর সার কথা এই ;

আত্মার বিষয়ে নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা

পূর্ণ শান্তি লাভ করাই কর্তব্য।

সূচীপত্র

আত্মানুসন্ধান

ভগবান শ্রীরমণ মহর্ষির উপদেশাবলী

শ্রীরমণাশ্রমম্

তিরুভন্নমালাই : : দক্ষিণভারত

ওঁ শ্রীরমণায়নামা

১ম অধ্যায়

আত্মানুসন্ধান

এই পরিচ্ছেদে 'আত্মা' সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পথ অথবা 'আমি কে?' এ প্রশ্নের উত্তর পরিস্কারভাবে বিবৃত করা হয়েছে।

১। সর্ব জীবের মধ্যেই 'অহং-এর অনুভব কি স্বাভাবিক নয় যা তারা তাদের প্রতিটি কথায় প্রকাশ করে, যেমন, 'আমি এসেছিলাম' 'আমি গিয়েছিলাম,' 'আমি করেছিলাম,' 'আমি ছিলাম' ইত্যাদি? 'অহং' বলতে কি বোঝায় জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে দেহকে আত্মার সঙ্গে এক করে ভাবা হচ্ছে। কারণ, আমাদের গতিবিধি, কাজকর্ম সবই দেহ করছে। দেহ কি তাহলে আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে? জন্মের আগে ত এই দেহের অস্তিত্ব ছিল না, পঞ্চভূত দিয়ে তা গড়া হয়েছে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার কথা আমরা ভুলে যাই* এবং অবশেষে একদিন এই দেহের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং দেহ আত্মা হতে পারেনা। শরীরের মধ্যে 'আমির' এই যে চেতনা তার অন্য নাম 'অহং' 'অজ্ঞান' 'মায়া' সব শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য এই 'আমি' সম্বন্ধে অনুসন্ধান। তাদের মতে 'অহং' বোধ লুপ্ত হলেই মুক্তিলাভ ঘটে। কিন্তু তার প্রতি উদাসীন থাকার উপায় কি? দেহ ত একখণ্ড কাঠেরই মতো অচেতন পদার্থ তা কি আত্মার মতো জ্যোতিমান হতে পারে, পারে আত্মার মতো কাজ করে চলতে? পারে না। তাই দেহের চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখতে হবে যেন

* অর্থাৎ আমরা দেহ সম্পর্কে সচেতন থাকি না।

সত্যিই দেহ একটি মৃত পদার্থ (শব)। 'আমি' শব্দটি আর উচ্চারণও করোনা, কিন্তু তোমার অন্তরে যে জ্যোতিমান আত্মা আছে তার কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাক। বিচিত্র এবং বহুমুখী চিন্তার স্রোতকে ছাড়িয়ে সেই বহমান অখণ্ড চেতনা, নিঃশব্দ এবং স্বতোৎসারিত হয়ে 'আমি—আমি' রূপে হৃদয়ের মধ্যে জেগে উঠবে। এই চেতনাকে ধারণ করে কেউ যদি স্থির হয়ে থাকতে পারে তাহলে দগ্ধ কর্পূরের মতো দেহগত 'আমি' সম্পূর্ণ লুপ্ত হবে। মুনি ঋষিরা এবং শাস্ত্র একেই মুক্তি বলে থাকেন।

২। অজ্ঞানতা কখনও আত্মাকে পুরোপুরি ঢাকতে পারে না। সাধারণ অজ্ঞান ব্যক্তিও 'আমি'-র কথা বলতে ভুল করেনা। 'আমিই আত্মা' 'আমিই নির্মল চৈতন্য'—অজ্ঞানতার এই বাস্তব সত্যকে ঢেকে রাখে এবং অজ্ঞান ব্যক্তি এই দেহটাকে আত্মা মনে করে ভুল করে ফেলে।

৩। আত্মা স্বতঃই ভাস্বর। তার কোন মানসিক ছবি তৈরি করবার প্রয়োজন নেই। যে মন চিন্তা ধারা কল্পনা করে সেই মন নিজেই আবার বন্ধন সৃষ্টি করে। কেন না আত্মা সেই প্রোজ্জ্বল সত্তা যা আলো এবং অন্ধকারকে অতিক্রম করে। তার কথা মন দিয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। এ ধরণের কল্পনা বন্ধনে পর্য্যবসিত হয়, অথচ আত্মা অনির্বর্চনীয় বলে স্বতঃই দ্যুতিমান। ভক্তিসহ ধ্যান দ্বারা আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান মনকে ক্রমশঃ আত্মার মধ্যে ডুবিয়ে দেয় এবং মুক্তির পথে অপরিমেয় শান্তির দিকে নিয়ে যায়। মহর্ষিদের মতে আত্মার এই প্রকার অনুসন্ধান দ্বারাই মুক্তি লাভ করা যায়। 'আমি ভেবেছিলাম'—একথার মধ্যে যে 'অহং' প্রকাশিত, মায়ারূপ বৃক্ষের তা-ই মূল এবং মূলচ্ছেদ করলে গাছ যেমন ভূপতিত হয় সেইরূপ এই 'অহং'-এর ধ্বংস ও মায়াকে নির্মূল করে। 'অহং'-কে

ধ্বংস করার এই সহজ উপায়কেই শুধু ভক্তি, জ্ঞান, যোগ বা ধ্যান নামে অভিহিত করা যায়।

৪। 'আমিই দেহ' এই ধারণা পঞ্চকোষ* সমন্বিত তিনটি** আকার ধারণ করছে। এরা যেহেতু সেই চেতনার ওপর নির্ভরশীল অতএব তার লুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এরাও অবলুপ্ত হয়। শাস্ত্রমতে চিন্তাই একমাত্র বন্ধন, সুতরাং পৃথক পৃথক ভাবে এদের নির্মূল করার কোন প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রকারদের সর্বশেষ উপদেশ হচ্ছে অহংরূপী মনকে আত্মার কাছে সমর্পন কর এবং স্থিরচিত্তে তাঁকে স্মরণ কর, বিস্মৃত হয়ো না।

---

* অর্থাৎ, জড়, ইন্দ্রিয়জ, মানসিক, বৌদ্ধিক এবং শান্তিময়।

** অর্থাৎ, জাগ্রত, স্বপ্ন ও গভীর নিদ্রা—এই তিন অবস্থায় জড় শরীর, মনোশরীর ও কারণ শরীর।

২য় অধ্যায়

মনের প্রকৃতি

এই অধ্যায়ে মনের প্রকৃতি, তার বিভিন্ন অবস্থা এবং তার অবস্থান বিবৃত হল।

১। হিন্দু শাস্ত্র মতে 'মন' বলে একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে। তার উৎপত্তি খাদ্যের সূক্ষ্ম গুণাগুণ থেকে এবং ভালবাসা, ঘৃণা, লোভ ক্রোধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশমান। সেই মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, ইচ্ছা এবং অহং-এর যোগফল যা বিচিত্র সব কাজ করলেও সাধারণতঃ 'মন' বলে অভিহিত। সে নিজে অচেতন হলেও চেতন বলে প্রতীয়মান হয়-কেননা, বিশুদ্ধ চেতনার সঙ্গে তাকে যুক্ত করে ভাবা হয় বলে। আগুনে পোড়ান একখণ্ড জলন্ত লাল টকটকে উত্তপ্ত লৌহখণ্ডকে যেমন আগুন বলে ভুল হয়, এও তেমনি। তার মধ্যে বিশ্লেষণ ক্ষমতা বর্তমান। সে ক্ষণস্থায়ী এবং তার বিভিন্ন অংশকে লাক্ষা, সোলা বা মোমের মত নানারকম রূপদান করা সম্ভব। সে সব তত্ত্বের ভিত্তিভূমি। দৃষ্টি যেমন চোখে, শ্রবণশক্তি যেমন কানে তেমনি তার অবস্থান হৃদয়ে। সে ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে চরিত্রদান করে, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং বস্তুজগতের চেতনাকে তার নিজস্ব চেতনায় পর্য্যবসিত করে, ভাবখানা ; 'আমি এই বস্তুকে অনুভব করছি।'

কোন জিনিষ খাব কি খাবনা এই যে চিন্তা—এ মনেরই একটি চিন্তার রূপ। 'এ জিনিসটা ভাল, ওটা নয়; এটা খাওয়া চলবে, ওটা চলবে না,'—এ ধরণের বিভেদমূলক ধারণা বুদ্ধিকেও বিভেদধর্মী

করে। মনের মধ্যেই সেই তত্ত্ব রয়েছে যা ব্যক্তিরূপে, ঈশ্বর এবং জগৎরূপে প্রকাশিত। আত্মার মধ্যে তার বিলুপ্তিই মুক্তি এবং তারই নাম 'কৈবল্য' এবং এই পরমাত্মাই ব্রহ্ম।

২। ইন্দ্রিয়ের অবস্থান শরীরের বহির্দেশে এবং তারা বস্তুজগৎকে চিনতে সাহায্য করে। মনের অবস্থান অন্তর্দেশে এবং সে দেহের অন্তর্নিহিত ইন্দ্রিয়। 'আন্তরিক' এবং 'বাহ্যিক' দেহের বিশেষণ, অনির্বচনীয় আত্মার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। পুরো বস্তুজগৎটাই যে অন্তরে অবস্থিত, তার কিছুই যে বাহ্যিক নয়—একথা বোঝাবার জন্য বিশ্বচরাচরের আকৃতিকে শাস্ত্রকাররা হৃদ্‌পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্বর্ণকারের মোমের তাল যেমন অসংখ্য স্বর্ণকণিকা লুকিয়ে রাখলেও বাইরে থেকে মোমের তাল বলেই প্রতীয়মাণ হয়, মানুষও তেমনি অবিদ্যা বা মায়ায় ডুবে থাকে। কেবলমাত্র ঘুমের মধ্যেই তারা আত্মা সম্বন্ধে সচেতন হয়, আত্মার মধ্যে মগ্ন হয়ে থাকে। তাই মনকে আত্মায় পরিণত করা অবশ্য প্রয়োজন।

৩। বস্তুতঃ মন হচ্ছে শুধুমাত্র চেতনা, কেননা মন নির্মল ও স্বচ্ছ। কিন্তু সেই নির্মল অবস্থায় তাকে মন বলা চলবে না। একটি জিনিসের সঙ্গে অন্য জিনিসের ভুল সম্পর্ক স্থাপন কলুষিত মনের কাজ। অর্থাৎ নির্মল এবং অকলুষিত মন, যা অনির্বচনীয় আত্মা, যখন তার মূল প্রকৃতি-বিস্মৃত হয়ে তামসিকতার বশীভূত হয় তখন বস্তুজগৎরূপে প্রতিভাত হয়। সেই রকম রজঃগুণের বশীভূত হয়ে সে দেহের সঙ্গে নিজেকে এক মনে করে, বস্তুজগতে 'আমি' রূপে প্রকাশিত হয় এবং তাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করে। প্রেম এবং ঘৃণা তখন তাকে বিচলিত করে আর তারই ফলে সে ভাল এবং খারাপ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং অবশেষে জন্মমৃত্যুর আবর্তে ধরা পড়ে যায়। গভীর ঘুমের মধ্যে এবং

অজ্ঞান অবস্থায় নিজের আত্মা বা বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যে কোন চেতনা থাকে না এ অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। 'আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম,' 'আমি চেতনা ফিরে পেলাম'—এই বিশেষ জ্ঞানের জন্ম স্বাভাবিক অবস্থা থেকে। এর নাম 'বিজ্ঞান।' বিজ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়, আত্মা বা অনাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান যখন আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় সত্য জ্ঞান বা অখণ্ড জ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান যখন অনাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় অজ্ঞান। বিজ্ঞান আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হলে যে অবস্থার জন্ম হয় তার নাম আত্মার স্ফূরণ। এই স্ফূরণ কিন্তু আত্মা থেকে পৃথক নয়, ভাবী আত্মানুভূতিরই ইঙ্গিত। অবশ্য এ অবস্থাও আদি সত্তার অবস্থা নয়। এই ইঙ্গিত যার মধ্যে প্রকাশিত তার নাম 'প্রজ্ঞান।' বেদান্ত একেই বলেছে 'প্রজ্ঞান ঘন।' এই শাশ্বত অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে বিবেকচূড়ামণি বলেছেন, "বুদ্ধিকোষের ভিতরে আত্মা চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাকেই তোমরা লক্ষ্য কর এবং অখণ্ড চিন্তা দ্বারা অনুভূতির মধ্য দিয়ে তাকে তোমার নিজের আত্মা বলে উপভোগ কর।"

তিন অবস্থা

৪। চির ভাস্বর আত্মা এক এবং বিশ্বজনীন। জাগ্রত, স্বপ্ন ও গভীর নিদ্রা—ব্যক্তির জীবনে এই তিনটি অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে। কিন্তু এই তিন অবস্থাতেই আত্মা পবিত্র এবং অপরিবর্তনীয় থাকে। জড়শরীর, মনোশরীর ও কারণশরীর—এই তিন শরীর আত্মাকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারেনা; এবং দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃষ্ট এই তিনের সম্পর্ককেও আত্মা উর্দ্ধে অতিক্রম করে যায়। এই যে মায়াগুলির

(অধ্যাসগুলি) কথা এখানে বললাম এগুলিকে অতিক্রম করে বিরাজমান আত্মার অপরিবর্তনীয় প্রকৃতিকে বোঝবার পক্ষে পরের রেখাচিত্রটি সহায়ক হবে।
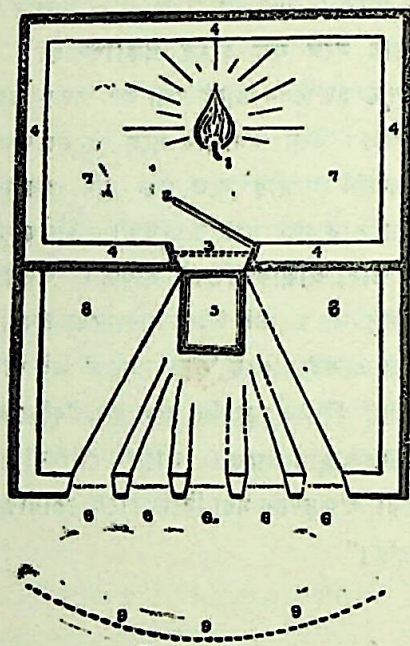
১।	অগ্নিশিখা	আত্মার-প্রতীক
২।	দরজা	নিদ্রার ,,
৩।	দ্বারপথ	অহঙ্কারের (মহৎ) প্রধান উৎসস্থল বৌদ্ধিকতার-প্রতীক
৪।	অভ্যন্তরভাগের দেওয়াল	অবিদ্যার-প্রতীক
৫।	অমলিন দর্পণ	অহংএর ,,
৬।	জানালা	পঞ্চেন্দ্রিয়ের ,,

৭।	অভ্যন্তর ভাগের প্রকোষ্ঠ	ঘুমন্ত অবস্থায় কারণ শরীরের প্রতীক
৮।	মাঝের প্রকোষ্ঠ	স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরের „
৯।	মুক্ত প্রাঙ্গণ	জাগ্রতাবস্থায় জড় শরীরের প্রতীক

অভ্যন্তর ভাগের ও মাঝের প্রকোষ্ঠদ্বয় এবং মুক্ত প্রাঙ্গণ—এই সমস্ত নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তা।

উপরের রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে স্বতঃদীপ্যমান আত্মার ভাস্বর চেতনাই কারণশরীরের (৭) রূপ নিয়ে অবিদ্যার (৪) দেওয়ালে ঘেরা অভ্যন্তর ভাগের প্রকোষ্ঠে কাজ করে চলেছে, আবার কালপ্রবাহ ও ব্যক্তির নিয়তি অনুযায়ী প্রাণিক শক্তিরাজির দ্বারা চালিত হয়ে নিদ্রার (২) দরজা খুলে দ্বারপথের (৩) ভিতর দিয়ে মধ্যস্থিত অহংয়ের দর্পণে (৫) প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। সেই প্রতিবিম্বণের ফলে উচ্ছি ত রশ্মির সাহায্যে নিদ্রাবস্থার প্রতীক মাঝের প্রকোষ্ঠে (৮) এসে পড়েছে সেই চেতনা; এবং অতঃপর সে-ই পঞ্চেন্দ্রিয় বা পাঁচটি জানালার (৬) পথ দিয়ে জাগ্রতাবস্থার প্রতীক মুক্ত প্রাঙ্গণে (৯) নিজেকে উপস্থাপিত করেছে। যখন কালপ্রবাহ ও ব্যক্তির নিয়তি অনুয়ায়ী বায়ুর (অর্থাৎ প্রাণিক শক্তিরাজির) চালনায় নিদ্রার দরজা (২) হয় বন্ধ, তখন সেই চেতনা জাগ্রতাবস্থা ও স্বপ্নাবস্থা হতে অব্যাহতি নিয়ে গভীর প্রসুপ্তিতে প্রবেশ করে এবং সেখানে অহং-এর বোধ লুপ্ত বলে আপনাতে আপনি বিরাজ করে। অহং এবং নিদ্রা, স্বপ্ন ও জাগ্রত—এই তিন অবস্থার পরপারে আত্মা প্রশান্তমধুরভাবে কিরূপে বিরাজমান তাও দেখানো হয়েছে।

৫। ব্যক্তির আত্মা জাগ্রতাবস্থায় থাকেন চোখে, স্বপ্নাবস্থায় থাকেন স্কন্ধে* এবং গভীর নিদ্রার সময় থাকেন হৃদ্দেশে; কিন্তু

* স্কন্ধের পশ্চাৎভাগে মেডুলা ও বলংগাতায়।

প্রকৃতপক্ষে ঐ তিনটি স্থানের মধ্যে হৃদ্দেশই হচ্ছে মুখ্য স্থান; আর তাই ব্যক্তির আত্মা কখনোই হৃদ্দেশ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন না। যদিও নানাভাবে বলা হয়ে থাকে যে, মনের আসন হচ্ছে স্কন্ধদেশ, বৌদ্ধিকতার স্থান মস্তিষ্ক, এবং হৃদ্দেশ বা সারা দেহই অহং-এর আসন, তবু শাস্ত্র নিসংশয়ে বলছেন, যে সকল অন্তরিন্দ্রিয়গুলি* একযোগে হৃদ্দেশে নিবাস করেন। এই অন্তরিন্দ্রিয়গুলির সমষ্টিকেই আবার মন বলা হয়। ঋষিরা শাস্ত্রের বিভিন্ন ধরণের সমস্ত ব্যাখ্যা পরীক্ষা করে মূল সত্যটি সংক্ষেপে প্রকাশ করে বলেছেন যে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতাই প্রমাণিত করে যে হৃদ্দেশই 'আমি'র মুখ্য নিবাস।

৩য় অধ্যায়

জগৎ

এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে জগতের নিজস্ব কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং আত্মা হতে তা পৃথক নয়।

১। **সৃষ্টি :**—শাস্ত্র প্রধাণতঃ বলতে চান যে এই জগৎ মায়াময় এবং পরমাত্মাই একমাত্র সত্য। এই বিশ্বাসেরই অনুকূল একটি সৃষ্টিতত্ত্ব শাস্ত্রে গড়ে তোলা হয়েছে। এমন কি সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে বিশদ বর্ণনাও তাঁরা দিয়েছেন এবং নিম্নতম অধিকারী তত্ত্বজিজ্ঞাসুদেরই জন্য তাঁরা পরমাত্মার পুনঃপুনঃ প্রকাশ, প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের বিশ্লিষ্ট হওয়া** জগৎ, দেহ, প্রাণ ইত্যাদির বর্ণনাও দিয়েছেন। কিন্তু উচ্চ

* অন্তঃকর্ণ কথাটির অর্থ মন, বৌদ্ধিকতা ও অহং-এর সমষ্টি।

** প্রকৃতি—মূল তামিলে এই কথাটির অর্থ এই যে সামঞ্জস্য, কর্ম ও অন্ধকার প্রকৃতিতে নিহিত এই তিনটি গুণের ভারসাম্যের বিচ্যুতি—এবং তারই ফলে বস্তুজগতের আবির্ভাব ঘটে।

অধিকারী জিজ্ঞাসুদের শাস্ত্র সংক্ষেপে এই কথাই বলেন যে ব্যক্তিসত্তার অজ্ঞানতা এবং ফলতঃ চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকার ফলেই স্বপ্নে রঙীন দৃশ্য দেখার মতোই জগৎ ও আমাদের কাছে আপাততঃ সত্য ও (পরমাত্মা হতে) স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী বলে প্রতীত হয়। শাস্ত্র তাই সত্য প্রকাশের খাতিরে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করতে চান। যাঁরা প্রত্যক্ষ ও স্বকীয় অভিজ্ঞতায় আত্মাকে উপলব্ধি করেছেন তাঁরা সন্দেহাতীত ভাবে সুস্পষ্টরূপে জেনেছেন যে দৃশ্যমান জগতের বাস্তব ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আদৌ নেই।

দ্রষ্টা ও দৃষ্টের পৃথকত্ব

দৃষ্ট বস্তু : নিশ্চেতন	দ্রষ্টা : চেতন
দেহ, কোন পাত্র ইত্যাদি	চক্ষু
চক্ষু	মস্তিষ্কে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থল
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্থল	মন
মন	ব্যক্তির আত্মা বা অহং
ব্যক্তির আত্মা	বিশুদ্ধ চৈতন্য।

ব্যক্তির আত্মা বিশুদ্ধ চৈতন্য বলেই, উপরোক্ত তালিকার বর্ণনা অনুযায়ী, সমস্ত জ্ঞাত হন এবং তাই তিনিই চূড়ান্ত দ্রষ্টা। আর সবই : অর্থাৎ অহং, মন প্রভৃতি নিছক বস্তুমাত্র। উপরের তালিকায় দেখানো হয়েছে যে আগের পংক্তিতে যাঁকে কর্তা বলে জানছি পরের পংক্তিতে তিনিই বস্তুতে পরিণত হচ্ছেন; অতএব আত্মা বা বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত আর সবই বাহ্যায়ত বস্তু বলে প্রকৃত দ্রষ্টা হতে পারেন না। যদিও আর কেউ আত্মাকে জানতে পারেনা বলে আত্মাকে বাহ্য বস্তুতে পরিণত করা সম্ভব নয় এবং যদিও আত্মাই সব কিছু দেখেন বলে তিনিই দ্রষ্টা, তবু আপেক্ষিকতার ক্ষেত্রে দ্রষ্টা—দৃষ্ট সম্পর্ক ও আত্মার আপাতঃ কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকে কিন্তু

পরমাত্মার মাঝে এ সব লুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে আত্মা ছাড়া আর কিছুয়ই অস্তিত্ব নাই, তিনি দ্রষ্টাও নন দৃষ্টও নন, তিনি কর্তাও নন বস্তুও নন—এসব সম্পর্কের মধ্যে তিনি বাঁধা পড়েন না।

৪র্থ অধ্যায়

জীব

এই অধ্যায়ে আত্মাই যে জীব সেকথা বলা হয়েছে এবং জীবের ধর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'আমি'—বোধই মন। মন এবং অহং একই জিনিস। মনন, ইচ্ছা, অহং এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এসবই মন। এ যেন একই লোককে তাঁর নানারকম ভূমিকার দরুণ নানা নামে ডাকা। ব্যক্তি অহং ছাড়া কিছু নয়, অহং আবার মনেরই নামান্তর। অহংএর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মন আবির্ভূত হয়, পূর্বোক্ত লালাভ-তপ্ত লোহার দৃষ্টান্তে আমরা যেমন দেখেছি তেমনি, আত্মার প্রতিবিম্বিত রূপের সঙ্গে এই অহং ও মন জড়িত। লালাভ-তপ্ত লোহার মধ্যে যে আগুন আছে তা কেমন করে বুঝব? ঐ লোহা আর আগুন একই জিনিস বলে বুঝব কি? এখন, ব্যক্তি অহং ছাড়া আর কিছু নয়। আগুন ও লালাভ-তপ্ত লোহা যেমন অবিচ্ছেদ্য আত্মা ও অহং বা ব্যক্তিও তেমনি অবিচ্ছেদ্য। অতএব অহংরূপ ক্রিয়াপর ব্যক্তি ভিন্ন ব্যক্তিকে আর কেউ দেখছে না। আর অহং কি? না, প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা মন। লোহাতে যে আগুন*

---

* লালাভ-তপ্ত লোহাকে কামার হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারলে আগুনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, লোহাখানির আকৃতি বা রূপ পরিবর্তিত হয় মাত্র। ঠিক তেমনই, জীবনের ওঠা-পড়া, সুখ-দুঃখ এসবে অহংই প্রবাহিত হয়, আত্মা নিত্যশুদ্ধ ও বিকৃতিশূন্য থাকে।

আছে সেই আগুনেরই মতো এক আত্মাই হৃদয়ে অমলিনরূপে বিরাজ করেন আবার তিনিই ব্যাপ্ত চরাচরের মতো অসীম। হৃদ্দেশে বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে তিনি স্বতঃ-ভাস্বর, তিনি দ্বিতীয়রহিত; আবার সকল জীবের মধ্যে এক তিনিই বিশ্বজনীনভাবে প্রকাশিত। তাঁর সেই বিশ্বজনীন রূপকে বলি পরমাত্মা। হৃদয়ে সেই পরমাত্মারই আর এক নাম, কেননা তিনিই সকলের হৃদয়ে আছেন।

অর্থাৎ, লালাভ-তপ্ত লোহাখানা হচ্ছে ব্যক্তি, অগ্নিময় উত্তাপ হচ্ছে যিনি দেখেন সেই আত্মা, লোহা হচ্ছে অহং। বিশুদ্ধ অগ্নি হচ্ছেন সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ পরমাত্মা।

৫ম অধ্যায়

পরমপুরুষই আত্মা

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে আত্মার রূপ ভগবানের রূপ, এবং "অহম্ অহম্" রূপে তিনি বিরাজিত।

১। 'অন্তরে' রয়েছে যে ভাবকল্পনা আর 'বাইরের' যে বস্তুপুঞ্জ এই উভয়ের মধ্যেকার সঙ্গতির আড়ালে যে বিশ্বজনীনতত্ত্ব 'মন' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য তাতেই বিধৃত। অতএব, দেহ ও জগৎ যা আমার বাইরে আছে বলে মনে হয় তা আসলে মনেরই প্রতিবিম্বন। এই সমস্ত রূপের মাঝে হৃদয়ই আপনাকে প্রকাশ করছে। সর্বব্যাপক হৃদয়ের অন্তঃস্থলে, বিশুদ্ধ মনের প্রসারতায় স্বতঃভাস্বর 'আমি' নিত্যই দীপ্তিমান। যেহেতু তিনি প্রত্যেকের মধ্যেই প্রকাশিত তাই তাঁকে সর্বজ্ঞ সাক্ষীপুরুষ বা চতুর্থ অবস্থা (তুর)* বলা হয়।

পরমাত্মা বা আত্মা যাঁকে বলছি তিনিই সত্য, তিনিই অসীম প্রসারতা, অহং শূন্য চৈতন্যরূপে তিনিই 'আমি'র মধ্যে রয়েছেন—সকল

জীবে অদ্বিতীয় তিনিই বিরাজমান। চতুর্থ অবস্থাকে অতিক্রম করে যা আছে তা এই। এই কথা সর্বদা ধ্যান করতে হবে যে ব্যোম যেমন প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার অন্তরে নীলাভার মধ্যেও আছে, আবার অসীম অনন্তরূপেও আছে তেমনই পরমচৈতন্যের প্রসারতা চতুর্থ অবস্থার ভিতরে ও বাইরে সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজ করছে। দীপ্তি ব্যোম যেমন অগ্নিশিখাতে আছে আবার অগ্নিশিখাকে ছাড়িয়ে প্রসারিত হয়েছে, সত্য তাহাই (স্তর) তেমনি সকলকে ব্যাপ্ত করে আছে। আলোর দিকে তাকিও না। এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে সত্য অহং শূন্য অবস্থা। প্রত্যেকেই নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাতে যেয়ে বুকের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, যে পরমপুরুষ আত্মা রূপে হৃদ্দেশে নিবাস করেন। ঋষি বশিষ্ঠও বলেন, হৃদয়ে "আমি-আমি" রূপে যিনি নিত্য বিরাজিত তাঁকে ভুলে গিয়ে বাইরে আত্মার খোঁজ করে ফিরলে তা অমূল্য দিব্য রত্ন ফেলে আপাত ঝকঝকে নুড়ি কুড়াবারাই সমান হবে। বৈদান্তিকগণ[১] সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিলয়কর্তা সেই একই পরমাত্মাকে গণপতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বর এবং সদাশিব[২] প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতারূপে কল্পনা করাকে শাস্ত্রবহির্ভূত কাজ বলে মনে করেন।

মূল তামিল শব্দটি হচ্ছে তুরীয়। জাগ্রতাবস্থা হচ্ছে প্রথম অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা দ্বিতীয় অবস্থা এবং গভীর নিদ্রা তৃতীয় অবস্থা। যদিও বিশুদ্ধ চৈতন্যকে চতুর্থ অবস্থা বলা হয়, তবু বিশুদ্ধ চৈতন্য তিন অবস্থাতে বর্তমান থাকে আবার তিন অবস্থাকে ছাপিয়ে যায় বলে পূর্বোক্ত তিন অবস্থার সঙ্গে এর কোন তুলনা হয়না। জাগ্রত, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিন অবস্থাকে যখন অতিক্রম করে যায় একে তুরীয়াতীত বলা হয়।

১। ভারতীয় দর্শনের একটি শাখা বেদান্ত। এই শাখার অনুবর্ত্তিরা এক ও পরম সত্যে বিশ্বাস করেন, নাম ও রূপকে মায়া বলেই পরিহার করেন।

২। গণপতি রুদ্রের পুত্র, ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা, রুদ্র ধ্বংসকর্তা, মহেশ্বর বিশ্বমায়াধিপতি, সদাশিব হচ্ছেন মহাদেব, যাঁর করুণাপাতে মায়ার আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

পরমাত্মার উপলব্ধি

এই অধ্যায়ে আত্মোপলব্ধির উপায়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১। অহং দেহকেই ভুলে আত্মা বলে মনে করে ও তাই বহির্মুখী হয়; সেই অহং যখন হৃদয়ের মাঝে দমিত হয়, দেহে আত্ম-বোধ আর থাকেনা এবং শুদ্ধ মন নিয়ে দেহে প্রকৃতই কে বাস করেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা যায় তখন একটি সূক্ষ্ম উপলব্ধির আলোকে মন আলোকিত হয়ে ওঠে। 'আমি—আমি' এই বোধটি তখন কম্পিত হতে থাকে এবং বোঝা যায় এ আর কিছু নয়, ঈশ্বরের মন্দির এই দেহনগরে হৃৎপদ্মে সমাসীন পরমপুরুষ আত্মাই তিনি। তখন শান্ত, শুদ্ধ থাকতে হবে; এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আত্মা সবই হন আবার কিছুই হন না, তিনি অন্তরে আছেন বাহিরে আছেন—রয়েছেন এই সর্বত্র, আবার তিনি সর্বাতীত পুরুষ। 'শিবোহম্' (আমিই সেই পরমপুরুষ) মন্ত্রবীজ নিয়ে ধ্যান করা একেই বলে—একেই বলে চতুর্থ অবস্থা।

২। এই সূক্ষ্ম উপলব্ধিরও পরপারে যিনি আছেন তিনিই ঈশ্বর। তাঁকে নানা নামে ডাকা হয়েছে। বলা হয়েছে চতুর্থ স্তরের পরপারে তিনি অবস্থিত, তিনি সর্বানুভূঃ, আমাদের অন্তরের দিব্য শিখার সার রূপে বিরাজমান পরম পুরুষ তিনি। অষ্ট মার্গ যোগের ষষ্ঠ ও সপ্তম মার্গে স্মরণ ও ধ্যান কালে হৃদয়ের প্রসার, বিশুদ্ধ চৈতন্য, মানসাকাশে ভাস্বর পরমপুরুষ, শান্তি, আত্মা ও জ্ঞানরূপে তিনিই প্রকাশিত হন। "শিবোহম্" রূপে আত্মাকে সুদীর্ঘকাল ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান করে গেলে হৃদয়ে অজ্ঞানতার যবনিকা এবং তজ্জাত বাধাগুলি সব দূর হয় এবং পূর্ণ জ্ঞান লাভ ঘটে। এইভাবে হৃৎকন্দরে,

দেহমন্দিরে সত্যস্বরূপ নিবাস করেন এই জ্ঞান হওয়া আর সর্বত্র প্রবিষ্ট পরমপুরুষের উপলব্ধি ঘটা একই কথা ; কেননা ব্রহ্মাণ্ডের সবই আছে হৃদয়ে ধরা। শাস্ত্রও বলেন, "নবদ্বারসমন্বিত এই দেহে শান্তিতে নিবাস করেন ঋষি" এবং "দেহ মন্দির, ব্যষ্টি আত্মা পরমপুরুষ। তাঁকে যদি "শিবোহম্" বলে আরাধনা করা যায়, তবে মুক্তি অবশ্যম্ভাবী ; পঞ্চকোষের দেহই গুহা, হৃদয়ই গুহা, সর্বাতিশায়ী পুরুষই অধিষ্ঠিত গুহাধিপতি।" পরমপুরুষকে উপলব্ধির উপায় ডহর বিদ্যা বা হৃদয়ের বোধিসম্ভূত জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ। আরও বলবার কী আছে? প্রত্যেককেই প্রত্যক্ষ ও স্বকীয় উপলব্ধির দ্বারা তাঁকে লাভ করতে হবে।

৭ম অধ্যায়

আত্মানুসন্ধানই পূজা

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে আত্মার বিষয়ে সতত মননই প্রকৃত পূজা ও তপস্যা।

১। নৈর্ব্যক্তিক পরমপুরুষের পূজার উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমিই যে ব্রহ্ম এই কথাটি নিয়ত স্মরণ করা। কেননা "আমিই ব্রহ্ম" (ওঁ তৎসৎ) এই মন্ত্রটি ধ্যান করতে গেলে দরকার ত্যাগ, দান, ধর্মাচার, অনুষ্ঠান, প্রার্থনা, যোগ এবং পূজা। ধ্যানের পথে যেসব বাধাবিঘ্ন আসে তা জয় করবার একটি মাত্র উপায় আছে। তা এই। বাধাবিঘ্নগুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে মনকে সম্পূর্ণ নিষেধ করতে হবে। মনকে অন্তরমুখী করে আত্মার মাঝে নিয়ে আসতে হবে, সেখানে যা কিছু ঘটে তার অনাসক্ত সাক্ষী হতে হবে ; আর কোন উপায় নেই। এক মুহূর্তের জন্যও আত্মা হতে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে চলবে না। হৃদ্দেশে নিবাসী "আমি" বা আত্মার

উপর মন নিবদ্ধ করলেই যোগ, ধ্যান, প্রজ্ঞা, ভক্তি, জপ (অনুচ্চারিত বীজমন্ত্রের আবৃত্তি) এবং পূজা সফল হবে। যেহেতু পরমপুরুষ আত্মা রূপে বিরাজ করেন, অতএব আত্মায় নিবিষ্ট করে মনকে অবিরত নিবেদন করলেই পূজার সকলপ্রকার বিধি পালিত হবে। মন সংযত হলেই, আর সবই সংযমাধীন হবে। মনই প্রাণ-শক্তি; নির্বোধরাই বলে এর রূপ কুন্তলীকৃত সাপের[১] মতো। যে ছয়টি সূক্ষ্ম চক্রের[২] কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলি মনের কল্পনা মাত্র—যোগপথে নবাগতদেরই জন্য ওগুলির কল্পনা করা হয়েছে। আমরা মূর্তির মাঝে নিজেদের প্রক্ষেপ করি ও তারপর সেই মূর্তিগুলি পূজা করি—কারণ আমরা প্রকৃত অন্তর-পূজা কি তা বুঝিনা। তাই, সর্বজ্ঞ আত্মার জ্ঞানই পূর্ণ জ্ঞান।

২। নানাবিধ বিক্ষিপ্ত চিন্তারাজি আমাদের মনকে একমুখী হতে দেয়না। কাজেই আমরা যদি সতত ঈশ্বরস্বরূপ আত্মাকে মনন করি তবে ঐ এক চিন্তাই যথাসময়ে সকল বিক্ষেপ সরিয়ে দিয়ে অবশেষে নিজেই লুপ্ত হবে ও যে শুদ্ধ চৈতন্য শেষ পর্যন্ত থাকবে তিনিই ঈশ্বর। একেই বলে মুক্তি। আমরা নিজেরাই সর্বাঙ্গসুন্দর শুদ্ধ আত্মাকে যখন একটি মুহূর্তও ভুলবনা তখন ঘটবে যোগ, প্রজ্ঞা ও অধ্যাত্মসাধনার সকল মার্গের সিদ্ধি। যদি মন অতি চঞ্চল ও বাহ্য বিষয়ে লিপ্ত হয় এবং ফলতঃ নিজের আত্মা সম্পর্কেই অনবহিত থাকে তাহলেও আমাদের সচেতন হতে হবে, ভাবতে হবে "আমি দেহ নই। তবে আমি কে?" এইভাবে অনুসন্ধান কর, মনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও উৎসের দিকে।

১। মূল তামিলে কুণ্ডলিনী কথাটির অর্থ মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগে সুপ্ত একটি সজীব শক্তি—এই শক্তির জাগরণ ঘটলে প্রথমে সাধক সিদ্ধাইয়ের শক্তিগুলি লাভ করেন, পরে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়।

২। মেরুদণ্ড বরাবর মেরুদণ্ডের নিম্নতম প্রান্ত থেকে মস্তকশীর্ষ পর্যন্ত সূক্ষ্ম শরীরে এই চক্রগুলি অবস্থিত; প্রাণ-শক্তি নিচু থেকে চক্রগুলি ভেদ করতে করতে একে একে উপরে উঠতে থাকে। আর তাতেই সাধক সিদ্ধাইয়ের শক্তিগুলি লাভ করেন।

"আমি কে ?" এই আত্মানুসন্ধানই সকল দুঃখ বিদূরিত করে পরম সৌন্দর্যময়ের আবির্ভাব ঘটাবার একমাত্র উপায়। যেভাবেই বলা যাক না কেন, সংক্ষেপে এই হচ্ছে সার সত্য।

৮ম অধ্যায়

মুক্তি

এই অধ্যায়ের শিক্ষা এই যে "আমিই আত্মা" এই অর্থে "শিবোহম্" রূপে আত্মাকে নিয়ত ও সুদীর্ঘকাল ধ্যান করলেই মুক্তি লাভ করা যায়। জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্তের বৈশিষ্ট্যও বর্ণনা করা হয়েছে।

১। ব্যক্তির সত্তা আর মন একই জিনিস। এই ব্যক্তিসত্তা প্রকৃত আত্মার সঙ্গে আপন সাযুজ্যের জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে আর তাই নানা বন্ধনে নিজেকে ফেলেছে জড়িয়ে। তার আপন সনাতন ধর্ম ফিরে পাবার জন্য আত্মার অভিসার দেখলে মনে পড়ে সেই মেষ পালকের কথা যে সারাক্ষণ আপন কাঁধেই মেষশাবক রেখে তাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

যাই হোক, আত্মবিস্মৃত অহং, একবার আত্মা সম্পর্কে সচেতন হলেই মুক্তি—অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি—লাভ করেনা। কারণ মানস-সংস্কারের দরুন জমে-ওঠা নানা বাধা থাকে জড়িয়ে। দেহকেই বারবার সে আত্মার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, ভুলে যায় যে অহং নিজেই আত্মজাত। বহুযুগসঞ্চিত সংস্কার উচ্ছিন্ন করতে হলে "আমি দেহ নই, আমি পঞ্চেন্দ্রিয় নই, আমি মন নই, আমি আত্মা" এইভাবে বহুকাল ধরে ধ্যান করতে হবে। অতএব, অহং, অর্থাৎ মন, যা কিনা

কতকগুলি সংস্কার ও প্রবণতার পুঞ্জমাত্র আর যা 'আমি'—এর সঙ্গে দেহকে গুলিয়ে ফেলে—তাকে দমন করতে হবে এবং দীর্ঘকাল ঈশ্বররূপী আত্মাকে ভক্তিভাবে আরাধনা করলে তবেই আত্মোপলব্ধি নামক চূড়ান্ত মুক্তির স্তরে পৌঁছনো সম্ভব। আত্মা সকল দেব-দেবীর সত্তার নির্যাস। এই আত্মানুসন্ধানের ফলে মন লুপ্ত হয়ে। যায়, এবং শবদাহ খোঁচাবার লাঠিখানা ও যেমন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনি পরিশেষে ওই আত্মানুসন্ধান ও শুদ্ধ হয়ে যায়, এই হচ্ছে মুক্তির অবস্থা। আত্মা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, চৈতন্য পরমপুরুষ এবং ঈশ্বর বলতে একজনকেই বোঝায়।

২। একজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে দর্শন করলেই কি তুমিও একজন উচ্চপদস্থ হতে পার? না। ঐরকম হবার জন্য চেষ্টা করলে এবং ঐ পদের যোগ্যতা অর্জন করলে তবে অবশ্য তা হওয়া সম্ভব। সেই রকম, যে অহং মনেরই মতো পাশযুক্ত সে কি একবার মাত্র আত্মা বলে অনুভব করলেই দিব্য আত্মায় পরিণত হতে পারে? মন অবলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কি তা অসম্ভব নয়? একজন ভিক্ষুক রাজাকে দেখলে ও নিজেকে রাজা বলে জাহির করলেই রাজা হতে পারে? তেমনি, "আমি আত্মা, আমি ঈশ্বর" দীর্ঘকাল যাবৎ অখণ্ড ভাবে এই মন্ত্র ধ্যান করে মনের পাশ ছিন্ন করে না দিলে সর্বাতিশায়ী শান্তির অবস্থায় পৌঁছনো সম্ভব নয়। মনের অবলুপ্তি আর সেই অবস্থা একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ। "আত্মাই ঈশ্বর, ঈশ্বরই আত্মা; আত্মা একমাত্র ঈশ্বর। তুষ দিয়ে ঢাকা জিনিসটাই ধান, তুষ খসালেই বেরোবে চাল। তেমনি, কর্মের পাশের অধীন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ আত্মা ব্যষ্টিরূপ ধরে থাকে, আর আবরণ সরানো মাত্রই দেখা যায় পরমেশ্বরই 'আমি' রূপে বিরাজমান।" শাস্ত্র এই কথাই বলছেন। আর ও বলা হয়েছে,

"মনকে অন্তর্মুখী করতে হবে এবং অজ্ঞান মনরূপে আবির্ভূত অহং বোধ যতক্ষণ পর্যন্ত অবলুপ্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে সীমিত করে রাখতে হবে মনকে। একেই বলে প্রজ্ঞা ও ধ্যান,—আর বাদবাকি সব নিছক বক্তৃতা ও পাণ্ডিত্যের কচকচানি মাত্র।" এই পরম বাণী অনুসারে সর্বপ্রযত্নে তাঁকে স্মরণমনন করা তাঁর সম্পর্কে নিত্যচেতন হওয়া এবং তাঁকে উপলব্ধি করা আমাদের কর্তব্য।

৩। যেমন, একজন ব্রাহ্মণ অভিনেতা যে ভূমিকায়ই মঞ্চে অবতীর্ণ হোন না কেন তিনি যে নিজে ব্রাহ্মণ একথা কখনও ভোলেন না তেমনি প্রত্যেক মানুষ যে কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন যেন নিজেকে দেহের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে, গভীরভাবে যেন সচেতন থাকে যে সে আত্মা। মন যতই তার সনাতন প্রকৃতি ফিরে পাবে ততই এ বোধ প্রকাশিত হবে। তারপর অবশেষে আত্মা যখন স্বতঃই নিজেকে প্রকাশ করবেন তখন পূর্ণ শান্তি লাভ হবে। তখন বাহ্যবস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিত সুখে দুঃখে আর উদ্বিগ্ন হবেনা। স্বপ্নে যেমন দেখি তেমনি নিরাসক্ত দৃষ্টিতে আমরা সবকিছু দেখব। "এটা ভালো কি ওটা ভালো?" "এটা করব কি ওটা করব" এ ধরণের চিন্তা উদয় হতে দেওয়া উচিত নয়। যখনই একটি চিন্তার উদয় হয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে হবে। ক্ষণিকের তরে তাকে প্রশ্রয় দিলেও সে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর মতো তোমার পতন ঘটাবে। মূল কারণে যে মনকে নিবদ্ধ করেছি সে মনের কি আর অহং-বোধ বা কোন সমস্যা থাকতে পারে? এই ধরণের ভাবনা-চিন্তারাই কি হয়ে দাঁড়ায়না বন্ধনের কারণ? সুতরাং পুরানো সংস্কার ও প্রবলতাবশতঃ যখনই এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার উদয় হয় তখনই মনকে শুধু দমন করে তার সত্যস্বরূপের দিকে ফেরালেই চলবেনা, বাহ্য ঘটনাবলীর প্রতি নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষও যেন সে থাকে। আত্ম-

বিস্মৃতির দরুণই কি চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব ঘটেনা এবং তার ফলে আমাদের দুঃখ উত্তরোত্তর বেড়ে যায়না? যদিও "আমি কর্তা নই; সকল ক্রিয়াই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের নিছক প্রতিক্রিয়া" এ ধরণের বিচারশীল চিন্তা মনকে তার সনাতন স্বভাবের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে; তবু এও একরকম চিন্তা, অবশ্য অতিশয় চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিদের চিন্তার জট খুলবার পক্ষে এই চিন্তাটি সহায়ক। অন্যপক্ষে, আবার যে মন অটলভাবে দিব্য আত্মাতে নিবদ্ধ হয়েছে এবং সকল কর্মের মধ্যে নিযুক্ত থেকেও অচঞ্চল অনাসক্ত রয়েছে সে মন কি কখনও ভাবতে পারে "আমি দেহমাত্র, আমি কাজ করছি?" অথবা, "আমি কর্তা নই, এইসব ক্রিয়াই দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতি-ক্রিয়া মাত্র" এ ধরণের বিচারশীল চিন্তাও কি সে মনে আসতে পারে? ক্রমে ক্রমে, সর্বপ্রযত্নে, আমাদের চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা আত্মা সম্পর্কে নিত্য সচেতন হই। এতে সাফল্য লাভ করলেই সকলই করায়ত্ত হবে। আর কোনো বস্তুতেই যেন মন বিক্ষিপ্ত না হয়। নিয়তিচক্রে যে কাজেই নিযুক্ত হোক না কেন পাগলের মতো সে কাজে নিযুক্ত থেকেও আমিই কর্তা এ বোধটিও ভুলে যেতে হবে। সর্বদা আত্মাতে নিবিষ্ট থাকবে। বহু ভক্তই কি অনাসক্ত মনোভাব ও এরকম দৃঢ় নিষ্ঠার ফলেই পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেনি?

৪। যেহেতু সত্ত্বগুণই মনের সনাতন ধর্ম অতএব আকাশের মতো নির্ম্মল মনোভূমির বৈশিষ্ট্য। রজোগুণের প্রভাবে মন চঞ্চল হয়ে পড়ে এবং তমোগুণের প্রভাবে বাহ্য বস্তু জগৎরূপে সেই মনের প্রকাশ ঘটে। এইভাবে মন একদিকে অস্থির চঞ্চল হয় অন্যদিকে আবার নীরেট বস্তুরূপে আত্মপ্রকাশ করে—কাজেই সত্য স্বরূপ রয়ে যায় অজানা। সূক্ষ্ম রেশম সুতা বয়ন করা যায় না ভারী লোহার মাকুতে, না বা বোঝা যায় বায়ুতাড়িত দীপশিখার

আলোয় একখানি ছবির আলো-ছায়ার সূক্ষ্ম কাজ। তেমনি তমোগুণান্বিত স্থূল মন বা রজোগুণপ্রভাবিত চঞ্চল মনের সাহায্যে সত্যোপলব্ধি সম্ভব নয়। পরম সত্য অতি সূক্ষ্ম ও প্রশান্ত। তাই জন্ম জন্মান্তর ধরে অনাসক্ত ভাবে কর্তব্য কর্ম পালন করে এবং সদগুরু লাভ করে তাঁরই কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরমপুরুষকে অবিরত ধ্যান করলে মন মালিন্যমুক্ত হয়। তবেই তমোগুণের প্রভাবে মনের জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়া রজোগুণের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা—দুই-ই বন্ধ হবে। তখন মন তার অন্তর্দর্শিতা ও প্রশান্তি ফিরে পাবে। নিষ্ঠাভরে ধ্যান করার ফলে যে মন সূক্ষ্ম ও স্থির হয়েছে সেই মনেই আত্মার শান্তি পরিস্ফুট হয়। যাঁর সেই শান্তির উপলব্ধি ঘটেছে তিনিই জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়ে বাস করেন।

৫। নিরন্তর ধ্যানের দ্বারা মনকে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রভাব হতে মুক্ত করলে সূক্ষ্ম মনে আত্মার শান্তি সুস্পষ্টরূপে নেমে আসবে। এইভাবে মনের প্রসারের ফলেই যোগীরা সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। যিনি মনের এরূপ সূক্ষ্মতা অর্জন করেছেন এবং যাঁর আত্মোপলব্ধি ঘট্রেছে একমাত্র তিনিই জীবদ্দশায় মুক্ত হয়ে বাস করেন। রামগীতাতে* ওই একই কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম গুণাতীত, তিনি বিশ্বজনীন অভিন্ন পরমাত্মা। কিন্তু যিনি সেই স্তরের ও পারে চলে যান, তিনি অখণ্ড শাশ্বতের স্তরে পৌঁছেন, যিনি মন ও বাক্যের অতীত, তাঁকেই বলি বিদেহমুক্ত; অর্থাৎ, তখন উপরোক্ত সূক্ষ্ম মন ও অবলুপ্ত হয়, শান্তির উপলব্ধি ও তখন আর থাকেনা। তিনি তখন শান্তির অতল সমুদ্রে ডুবে যান, গলে মিশে যান, আর কোন কিছুর বোধই তখন থাকেনা। একেই বলে বিদেহমুক্তি। তার পরপারে কিছু নাই। এই হচ্ছে চরমতম স্তর।

---

* প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুদের এই ধর্মগ্রন্থখানি স ম্পূজিত হয়ে আসছে।

৬। যদি কেউ ক্রমাগত আত্মারূপে নিজেকে ভাবতে থাকেন তবে "আমিই পরমাত্মা" এই উপলব্ধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ; মনের চঞ্চলতা ও জাগতিক চিন্তা যথাসময়ে লুপ্ত হয়ে যায়। যেহেতু মন ব্যতিরেকে উপলব্ধি সম্ভব নয়, সূক্ষ্ম মনেই তাই উপলব্ধি ঘটে। যেহেতু বিদেহ মুক্তি অবস্থায় এমনকি সূক্ষ্ম মনেরও সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে, অতএব এই স্তর উপলব্ধিরও বাইরে। এ হচ্ছে সর্বাতিশায়ী স্তর। "আমি দেহ নই। আমি শুদ্ধ আত্মা''—* এই হচ্ছে জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ যিনি জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ করেন তাঁর সুস্পষ্ট দ্বন্দ্বাতীত উপলব্ধি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি মন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত না হয় তাহলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও নিয়তিচক্রে বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা কালে আপাতঃ দুঃখ লাভ করতে পারেন। তিনি অখণ্ড শাশ্বত শান্তি উপলব্ধি করেননি বলে লোকে মনে করতে পারে, কেননা মাঝে মাঝে তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে বলে ধারণা হয়। যাই হোক, দীর্ঘকাল যাবৎ অবিচ্ছিন্নভাবে ধ্যান করার ফলে যে মন সূক্ষ্ম ও প্রশান্ত হয়েছে একমাত্র সেই মনেই মুক্তির অপার শান্তি নেমে আসা সম্ভব।

৯ম অধ্যায়

অষ্টাঙ্গ জ্ঞানযোগ

এই অধ্যায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মনের মাধ্যমে মনঃসংযম দ্বারা আত্মোপলব্ধির যোগপথের বর্ণনা করা হয়েছে।

১। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ধ্যানরূপে ভক্তিলাভের যে কথা বলা হয়েছে তার জন্য যম, নিয়ম (অষ্টাঙ্গ যোগের অঙ্গ সমূহ) প্রভৃতি

* মূল তামিলে 'প্রারব্ধ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে এই যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে কর্মফল জমা হয়েছিল এখন তার ফলভোগ করতে হচ্ছে।

উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। এই অঙ্গ বা প্রকরণগুলিকে যোগ ও জ্ঞানের দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস (প্রাণ) শাসনকে বলে যোগ মনের অবলুপ্তিকে বলবে জ্ঞান। অধিকারীর বাসনা ও সংস্কার এবং যোগ্যতা বা পক্বতা অনুযায়ী কারও কাছে বা যোগ, কারও কাছে বা জ্ঞান সহজ লাগে। উভয়েরই পরিণতি এক, কেননা শ্বাস-প্রশ্বাস শাসন করলে মনঃসংযম আসে, এবং অপরপক্ষে, মনকে অবলুপ্ত করলে শ্বাস-প্রশ্বাস আপনি নিয়মিত হয়। উভয় উপায়েরই উদ্দেশ্য কিন্তু এক—মনের নিমজ্জন এবং অবলোপ।

২। যম (মিথ্যা কথা বলা, হত্যা করা, চুরি করা, লালসা, অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করার ইর্চ্ছা ইত্যাদি হতে বিরতি), নিয়ম (নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা), প্রত্যাহার (বাহ্য বস্তু থেকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের প্রতিনিবৃত্তি, ধারণা (মনঃসংযোগ) ধ্যান (অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন মনন), সমাধি (পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একীভবন এবং তার পরিণাম স্বরূপ ত্রিপুটির বিলোপ)। এই আটটি যোগের অঙ্গ। তন্মধ্যে, প্রাণায়াম বলতে বোঝায় তিনটি জিনিস: রেচক (শ্বাস ত্যাগ করা), পূরক (শ্বাস গ্রহণ) এবং কুম্ভক (ভিতরে শ্বাসবায়ু রক্ষা করা)। সমস্ত শাস্ত্রেরই মত, রেচক ও পূরকে একই সময় লাগে কিন্তু কুম্ভকে রেচক ও পূরকের দ্বিগুণ সময় লাগে। রাজ যোগে ভিন্ন মত পোষণ করা হয়। তাঁরা বলেন, কুম্ভকের চারগুণ সময় এবং রেচকের দ্বিগুণ সময় লাগে। রাজযোগে প্রাণায়ামের যে বিধান আছে অন্যান্য যোগপথের বিধানের চেয়ে তা শ্রেয়। রেচক, পুরক, কুম্ভক সমন্বিত এই প্রাণায়াম সাধকের ক্ষমতানুযায়ী, শরীরকে অযথা কষ্ট না দিয়ে কিন্তু নিয়মিতভাবে অভ্যাস করে গেলে শরীর হয়তো কিছুটা ক্লান্ত হতে পারে কিন্তু শরীরে নেমে আসবে প্রশান্তি এবং পূর্ণ শান্তি লাভ

করার বাসনা মনের ভিতর ক্রমশঃই জেগে উঠবে। তখন প্রত্যাহার প্রয়াস পেতে হবে। মনের সকল গ্রন্থিকে একসূত্রে বেঁধে একমুখী করারই নাম প্রত্যাহার—এর ফলে মন আর নামরূপধারী বাহ্য বস্তুর দিকে ধাবমান হয়না। যেহেতু এতদিন পর্যন্ত যে মন বাহ্য বস্তুর পিছনে ছোটাছুটি করে এসেছে হঠাৎ একদিন সে মন বাহ্য বিষয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে স্থির ও একমুখী হতে পারেনা, অতএব একটি মাত্র লক্ষ্যে তাকে নিবদ্ধ করে তার সব গ্রন্থিকে একসূত্রে বেঁধে দেবার চেষ্টা করা হয়। এই উদ্দেশ্যেঃ (১) মনে মনে প্রণব বা অন্য বীজমন্ত্র জপ করা হয় (২) ভ্রূমধ্যে মনোযোগ স্থির করা হয়; (৩) নাসিকার অগ্রভাগে মন নিবদ্ধ করা হয়, (৪) কাণের ভিতর যে ধ্বনি ওঠে তা ক্রমান্বয়ে এক একটি কাণ দিয়ে শোনা হয়, অর্থাৎ, বাম কাণের ভিতর যে ধ্বনি ওঠে তা শোনা হয় ডান কান দিয়ে আবার ডান কাণের ভিতরের ধ্বনি শোনার চেষ্টা করতে হয় বাম কাণ দিয়ে। ধারণার (একাগ্র মনোযোগ) চেষ্টা করতেই হবে। ধারণার অর্থ ধ্যানের উপযোগী একটি মাত্র কেন্দ্রে মনকে নিবদ্ধ করা। ধারণার পক্ষে উপযুক্ত স্থান রূপে হৃদয় ও ব্রহ্মরন্ধ্রকে (অর্থাৎ ব্রহ্মতালু) নির্দিষ্ট করা হয়। এই দুটির যে কোন একটি স্থানে দ্যুতিমান আলোকশিখার রূপে ইষ্টমূর্তি কল্পনা করতে করতে মনকে স্থির করতে হয়। যদি স্থান হিসাবে হৃদয়কে বেছে নিই তাহলে অষ্ট দল পদ্মের কথা ভাবতে হবে, আর যদি ব্রহ্মরন্ধ্রকে বেছেনিই তাহলেও অষ্টদল পদ্মের কথাই ভাবতে হবে, যদিও ব্রহ্মরন্ধ্রকে সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম অথবা ১২৫টী পাঁপড়ি দিয়ে গড়া পদ্ম বলা হয়েছে। এইভাবে মন স্থির করার পর ভাবতে হবে যে আমি ও আমার ইষ্ট এক, কিংবা, ওই যে আলোকশিখা ওই তো আমার আত্মারস্বরূপ। অর্থাৎ আর একভাবে বলতে গেলে, সোঽহম ভাবনা (আমিই তিনি) আশ্রয় করতে হবে। শ্রুতি (শাস্ত্র) বলেন, সর্বব্যাপী ব্রহ্মই হৃদয়ে 'আমি আমি' রূপে

উদ্ভাভাসিত,—তিনিই মনোবুদ্ধি সাক্ষীস্বরূপ। যদি জিজ্ঞাসা করি "আমি কে?" তাহলে দেখতে পাব তিনিই (পরমাত্মার বিগ্রহ) অহম-অহম ("আমি, আমি") রূপে হৃদপদ্মে স্পন্দিত হচ্ছেন। এরকম অভ্যাস করাকে ধ্যানও বলে। যার পক্ষে যেটা সহজ তার পক্ষে সেটাই অভ্যাস করা উচিত। এভাবে ধ্যান জমে উঠলে তখন লোকে আত্মসচেতনতা হারিয়ে ফেলে এবং কী যে সে করছে সে বোধও হারিয়ে ফেলে—মন ডুবে যায় আত্মার গভীরে। যে সূক্ষ্ম স্তরে প্রবেশ করলে স্পন্দনও রহিত হয়ে যায় তাকেই বলে সমাধির স্তর। কেবল, এই স্তরে ঘুম থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তাহলে লাভ হবে পরমা শান্তি। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এরকম অভ্যাস করে গেলে ঈশ্বর মহাযানে প্রবেশাধিকার দেবেন এবং তাঁর আশীর্ব্বাদে মানসিক শান্তি মিলবে। অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়ে বহু পুস্তক রচিত হয়েছে, তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথাই এখানে লেখা হল। যদি কেউ আরও জানতে ইচ্ছুক হন তবে তাঁকে যেতে হবে একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৃত যোগীর কাছে এবং তাঁর কাছ থেকে বিশদভাবে শিক্ষা লাভ করতে হবে।

৩। প্রণব :—প্রণব হচ্ছে ওঁকার। সাড়ে তিন মাত্রায় 'ওঁ' উচ্চারণ করতে হবে,—অর্থাৎ, অ উ (এই তিন মাত্রা) এবং ম (অর্ধ-মাত্রা)। 'অ' বর্ণের অর্থ জাগ্রতাবস্থা বা বিশ্বজীবাবস্থা, অর্থাৎ স্থূল দেহ ও সৃষ্টি। 'উ' বর্ণের অর্থ আত্মার স্বপ্নবস্থা বা তৈজসাজীবাবস্থা, অর্থাৎ সূক্ষ্ম দেহ ও পালন। 'ম' বর্ণের অর্থ গাঢ় নিদ্রাবস্থা বা প্রজ্ঞাজীবাবস্থা, অর্থাৎ কারণ শরীর এবং লয়। অর্ধমাত্রা তুরীয় (চতুর্থ স্তর) অবস্থা, আত্মস্বরূপ এবং অহম স্বরূপের প্রতীক। এরই পরের স্তর তুরীয়াতীত বা অখণ্ড শান্তির স্তর। অহম্‌-স্বরূপের ধ্যানে যে চতুর্থ স্তরে পৌঁছনো যায় "অ" "উ" "ম" সেই স্তরের সম্পদ। একে অমাত্রার স্তরও বলা

হয় কেননা ধ্বনিরূপ এই স্তরে তিরোহিত হয়ে যায়। একে মৌন মন্ত্র জপ এবং অদ্বৈত মন্ত্রও বলা হয়। পঞ্চাক্ষরের প্রভৃতির মতো মন্ত্রের সারই হচ্ছে এই অদ্বৈত মন্ত্র। প্রণবের যথার্থ উপলব্ধি লাভের উদ্দেশ্যেই এই প্রত্যাহার স্তরে নিঃশব্দ জপের উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

৪। অষ্টদল হৃৎপদ্মে আলোকশিখার মতো বিদ্যুদ্দীপ্তিময় অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ আকৃতি নিয়ে পরমপুরুষ সর্বব্যাপী হয়ে বিরাজ করছেন। তাঁকে সেখানে ধ্যান করলে পুরুষ অমৃতত্ত্ব লাভ করে। একেই বলে কৈলাস বৈকুণ্ঠ ও পরমপদ। এখানে যা বলছি তদনুযায়ী সাধক ধ্যান করবেন। এমন হতে পারে যে সাধক ও ইষ্টের মাঝে একটি অনৈক্য ও বিভেদ দেখা দেবে। ফলে আত্মার মধ্যে অসামঞ্জস্য বা দ্বিধাবিভক্তি আসবার সম্ভাবনার কথা মনে হবে। তাই সাধক যেন ইষ্টকে নিজেরই আত্মা রূপে ধ্যান করেন। কারণ সেই আলোকশিখাই তো 'অহম-অহম' রূপে স্পন্দিত হচ্ছে। অতএব এই আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সন্দেহের চোখে দেখার প্রয়োজন নেই। যত রকমের ধ্যান আছে তন্মধ্যে শেষোক্ত আত্মধ্যানই সর্বোত্তম। আত্মধ্যান সম্ভবপর হলে অন্য ধ্যানের প্রয়োজন নেই। অন্যান্য ধ্যানের কাজ এই একটি ধ্যানেই হবে; অন্যান্য ধ্যান করতে বলা হয় এই ধ্যানে যাতে সাফল্য আসে সেই উদ্দেশ্যে। মনের পক্কতা অনুযায়ী এক একজন এক এক রকম ধ্যান করবে। যদিও ধ্যানের নানা পথ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সেগুলি শেষে একই লক্ষ্যে মিশে যায়। এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই। "নিজেকে জানলেই ঈশ্বরকে জানা হয়। যিনি ধ্যান করছেন তিনি আত্মবিৎ না হয়ে বহিরস্থিত অনাত্মীয় ভগবানকে ধ্যান করলে ভগবান মিলবেনা—নিজের ছায়াকে কি নিজেরই পা দিয়ে মাপা যায়? আপনি যত মাপতে যাবেন ছায়া ততই সরে সরে দূরে যাবে।" শাস্ত্র তো সেই

কথা বলেন। সুতরাং আত্মাকে ধ্যান করাই সর্বোত্তম, কারণ আত্মাই সকল দেবতার পরমাত্মা।

———

১০ম অধ্যায়

বিজ্ঞানের অষ্ট-মার্গ

এই অধ্যায়ে বিজ্ঞানমার্গের (জ্ঞানযোগ) কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিজ্ঞানমার্গের সাহায্যে "একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্ম" উপলব্ধি অর্থাৎ সকলই সেই তিনি এই উপলব্ধি ঘটার ফলে আত্মসাক্ষাৎকার (আত্মোপলব্ধি) লাভ হয়।

১। যম, নিয়ম প্রভৃতির মতো জ্ঞান অষ্টাঙ্গের নানা উপাদান বিশদ বিশ্লেষণ করে দেখাবার সুযোগ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নেই। এই সাধনমার্গে প্রাণায়ামের রেচক (শ্বাস ত্যাগ) হচ্ছে দৈহিক ও জাগতিক নাম ও রূপ জিনিস দুটি ত্যাগ করা। পূরক (শ্বাস গ্রহণ) হচ্ছে নাম ও রূপকে পরিব্যাপ্ত করে আছে যে সৎ, চিৎ, আনন্দ তাঁকেই অন্তরে গ্রহণ করা। কুম্ভক হচ্ছে এইভাবে যা অন্তরে নেওয়া হয়েছে তা অন্তরে রক্ষা করা (আত্মসাৎ করা)। প্রত্যাহার হচ্ছে পরিত্যক্ত নাম ও রূপের মায়া যাতে আবার মনে না আসতে পারে সেজন্য সদাজাগ্রত থাকা। ধারণা হচ্ছে মনকে হৃদয়ে স্থির করা, যেন সে আর যত্রতত্র ছোটাছুটি না করে। "আমিই সৎ চিৎ আনন্দ (সচ্চিদানন্দ) আত্মা" এই যে প্রত্যয়টি অন্তরে ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে এই প্রত্যয়ে অচলপ্রতিষ্ঠ হলে মন হৃদয়ে স্থির হয়। ধ্যান হচ্ছে, "আমি কে?" এই

আত্মানুসন্ধানের কালে পঞ্চকোষের দেহকে সম্পূর্ণ শান্তস্থির করে দিলে যেমন "আমি আমি" রূপে স্বতঃই অহম্‌স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে ঠিক তেমনি নিরবচ্ছিন্ন চিন্তনের ফলে অহম্‌স্বরূপের উপলব্ধি হয়। এইরকম প্রাণায়ামের জন্য আসন (শরীরের ভঙ্গি) প্রভৃতি বিধি নানার কোন দরকার নেই। যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে এ জিনিস অভ্যাস করা যায়। মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে হৃদ্দেশে আত্মাস্বরূপ ঈশ্বরের যে চরণকমল বিরাজিত তাতে মনকে যে করে হোক নিবদ্ধ করা এবং তাঁকে কখনোই বিস্মৃত না হওয়া। আত্মা সম্পর্কে বিস্মৃতিই সকল দুঃখের মূল। প্রাচীনেরা বলেন এই বিস্মৃতি মুমুক্ষুর (মুক্তিকামী সাধক) পক্ষে মৃত্যুতুল্য। প্রশ্ন উঠতে পারে যে রাজযোগে প্রাণায়ামের যে বিধান আছে নিয়মিত তা অভ্যাস করা অনাবশ্যক কিনা। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব যে তা অনাবশ্যক নয় বরং তার প্রয়োজন আছে; কিন্তু রাজযোগবিহিত প্রাণায়াম যতক্ষণ অভ্যাস করা যায় ততক্ষণই কাজে লাগে অথচ জ্ঞান অষ্টাঙ্গের প্রাণায়ামে স্থায়ী সুফল ফলবে। উভয়রকম প্রাণায়ামেরই উদ্দেশ্য আত্মাকে বিস্মৃত না হওয়া এবং মনকে স্থির নিশ্চল করা। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কেবল কুম্ভক (জ্ঞান অষ্টাঙ্গের) বা অনুসন্ধানের (বিচার) সাহায্যে মন হৃদয়ে অবলুপ্ত হয়ে না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়মিত প্রাণায়াম (যোগ অষ্টাঙ্গের) অতি আবশ্যকীয়; কিন্তু তারপর তার আর প্রয়োজন থাকেনা। কেবল কুম্ভক এমনই জিনিস যার ফলে রেচক, পূরকের সাহায্য ছাড়াই প্রাণ হৃদয়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়। সাধকের অভিরুচি অনুযায়ী যোগ ও জ্ঞানের মধ্যে যে কোন একটি পথ অবলম্বন করে সাধক সাধনা করে যেতে পারেন।

২। সকল শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য মনঃসংযম। কেননা, মনের নাশই মোক্ষ বা মুক্তি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়মনই যোগ। সমস্ত কিছুকেই একই সত্যের নানা রূপ বলে দেখা বা একমেবাদ্বিতীয়ম (এক অখণ্ড

ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নেই) দেখাই জ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর কাছে নিজ নিজ সংস্কার ও বাসনা অনুযায়ী এ দুটির একটি পথ সহজ ও আরামপ্রদ বলে মনে হবে। দুরন্ত ষাঁড়কে এক গোছা কাঁচা ঘাস দেখিয়ে শান্ত ও সংযত করা যায়, জ্ঞানও ঠিক সেইরকম। আর ষাঁড়কে প্রহার করে দড়ি দিয়ে বাঁধলে যা দাঁড়াবে যোগ হচ্ছে তাই। জ্ঞানীরা একথাই বলেন। পূর্ণ অধিকারী ব্যক্তিরা মনঃসংযম, বেদান্ত প্রতিপাদিত সত্যের অনুসন্ধান, আত্মার অস্তিত্বে অবিচল বিশ্বাস ও আত্মদর্শন ও সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধি লাভ করে পরমলক্ষ্যে উপনীত হন। অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীরা কেবল কুম্ভক ও আত্মার দীর্ঘস্থায়ী ধ্যান সহায়ে হৃদয়ে মন নিবদ্ধ করেন। আরও নিম্নাধিকারীরা প্রাণায়াম প্রভৃতির সাহায্যে সাধনায় উচ্চাবস্থা লাভ করেন। এইসব ভেবে মনঃসংযমের যোগকে জ্ঞান অষ্টাঙ্গ ও যোগ অষ্টাঙ্গ এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেবল কুম্ভক লাভ করা পর্যন্ত প্রাণায়াম অভ্যাস করে গেলে যথেষ্ট সাধনা হবে। অন্যপক্ষে, রেচক ও পূরক বাদ দিয়েও বিচার (আত্মানুসন্ধান) সহ কেবল কুম্ভক সাধন করে নিরন্তর ধ্যানের মাধ্যমে ভক্তিযোগ দ্বারা সমাধি লাভ করা যায়। যদি সেটাই সহজ ও স্বভাবের অনুকূল মনে হয় তবে জাগতিক কর্ম করার সময় ব্যতিরেকে অন্য সব সময়ই অভ্যাস করা যেতে পারে। এবং সেজন্য যে বিশেষ কোনো নির্বাচিত স্থানের প্রয়োজন আছে তাও নয়, যা সুবিধাজনক তাই-ই পালন করতে হবে। মন ক্রমশঃ অবলুপ্তির পথে গেলে. আর কী হলো বা না হলো তা দেখার দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে যোগীর চেয়ে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এবং ভক্তিই মুক্তির উপায়। আত্মার রসে নিমজ্জিত থাকাই ভক্তি—আর আত্মাই তো প্রত্যেকের আবাস স্বরূপ। অতএব যদি তাঁর মাঝে মন নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে যাবার সাহস কোনোমতে একবার সঞ্চয় করতে পারি তবে আর যাই ঘটুক-না কেন, তাতে ভয় কি?

১১শ অধ্যায়

ত্যাগ

এই অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে চিন্তার সম্পূর্ণ অবলোপই সন্ন্যাস।

১। বাইরের জিনিসপত্র বর্জন করলেই সন্ন্যাস বা ত্যাগ হয়না, অহংকে ত্যাগ করতে হয়। যাঁরা প্রকৃত ত্যাগী বা সন্ন্যাসী তাঁদের নিকট নির্জনতা বা কর্মময় জীবন তুল্যমূল্য। ঋষি বশিষ্ঠ* বলেন: যেমন একজন ঘোরতর চিন্তান্বিত ব্যক্তি পথচলার সময় সামনে কী কাছে লক্ষ্য করেনা তেমনি কোনো ঋষি আত্মার মাঝে নিয়ত ডুবে থাকেন বলে ও তিনি অহংশূন্য বলে, কর্মব্যস্ত থাকলেও কর্মের কর্তা তিনি হন না। অন্যপক্ষে যেমন শয্যায় শুয়ে শুয়ে লোকে স্বপ্ন দেখে যে সে খাদের অতল গহ্বরে পড়ে যাচ্ছে তেমনি অহংবোধসম্পন্ন অজ্ঞান ব্যাক্তি নির্জনে গভীর ধ্যানে রত থাকলেও সকল কর্মের কর্তারূপে কর্মফলভাগী হয়”

---

* প্রাচীন যেসব ঋষির নামে যোগীরা শ্রদ্ধাপ্লুত হন ঋষি বশিষ্ঠ তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

১২শ অধ্যায়

সিদ্ধান্ত

সরল ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা এবং আন্তরিক ও ধারাবাহিক চেষ্টায় সর্বদুঃখের মূল অহংয়ের বিলোপ করা আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। অহং হতে উদ্ভূত মনের যাবতীয় ক্রিয়া বন্ধ করলেই অহং বিলুপ্ত হয়।

অহং না থাকলে কি চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তার উদয় হতে পারে? আর চিত্তবিক্ষেপকারী চিন্তা না থাকলে কি মায়া থাকা সম্ভব?

॥ ওঁ শ্রীরমণ অর্পণমস্তু ॥

Sri Ramanasrama Pusthakalayam

(Book-Depot)

TIRUVANNAMALAI, SOUTH INDIA.

By Devotees.

	Rs.	A.	P.
Self-Realisation or Life and Teachings of Sri Ramana Maharshi (Fourth Edition) ...	2	8	0
Who am I ? Oral Teachings of Sri Ramana Maharshi, translated ; 4th & Revised Edition (Pocket Size) ...	0	2	0
Sat-Darsana Bhashya and Talks with Maharshi. Free Sanskrit rendering of Sri Ramana Maharshi's Tamil *Ulladu Narpadu.* (with Translation and commentary in English) Calico	(To be printed.)		
Upadesa Saram. (Translated from Maharshi's Tamil *Upadesa Saram)* Third Edition Warapper ...	0	4	0
Five Hymns to Sri Arunachala (Translated from the Tamil Original of Sri Ramana Maharshi) Second & Revised Edition ...	0	4	0
Sri Ramana Gita. Translated	(To be printed.)		
Ulladu Narpadu. Translation of Maharshi's Tamil Original *Ulladu Narpadu* with Supplement. ...	0	5	0

A Catechism of Enquiry. Being a translation of the Original. Teachings of Sri Ramana Maharshi, III Edn. (To be printed)

A Catechism of Instruction. Being a translation of the Original Teachings of Sri Ramana Maharshi, III Edn. (To be printed)

Maharsh's Gospel. Being His Answers to questions put to Him: Books I & II-III Edn. (To be printed)

Maharshi and His Message. (By Paul Brunton) (To be printed)

Sri Maharshi. Profusely illustrated. Third Edition. Revised & Enlarged. Cardboard ,,

Sri Ramana. The Sage of Arunagiri (by Aksharajna) ,,

40 Verses in Praise of Sri Bhagavan ,,

[Block Pictures single-or tri-coloured of Bhagavan Sri Ramana Maharshi are available.]

Orders below Re. 1 should be accompained by remittance or Indian postal stamps for the value of books and postage.)

Can be had of :—

Sri Niranjananda Swamy,
Sarvadhikari: Sri Ramanasramam
Sri Ramanasramam P. O.
Tiruvannamalai—South India.

শ্রীরমনাশ্রম পুস্তকালয়

সংস্কৃতানি	টাকা	আনা	পাই
উপদেশসারঃ (সভাষ্যম্)	০	৵০	০
সদ্দর্শনম্ ”	০	৸০	০
শ্রীরমণগীতা	০	।০	০
শ্রীঅরুণাচলপঞ্চরত্নদর্পণম্	০	৵০	০
শ্রীরমণাষ্টোত্তরম্	০	০	৲১০
শ্রীরমণাষ্টোত্তরশতমণিমালা	০	৵০	০
শ্রীরমণচত্তারিংশৎ	০	৵০	০
শ্রীরমণমানসিকপূজা	০	৵০	০
হিন্দী			
শ্রীরমণচরিতামৃত	১	৸০	০
শ্রীমহর্ষি—১১২ চিত্রোং কে সহিত	০	৸০	০
মৈং কৌন হূঁ ?	০	৵০	০
গুজরাতী			
আত্মানুসন্ধান	০	।০	০
তত্ত্ববোধ	০	।৴০	০
সদ্দর্শন চালীসী	০	।৵০	০
শ্রীরমণবাণী—ভাগ (১) তথা (২)	০	॥৴০	০
হুঁ কোন ?	০	৵০	০
উপদেশ সার	০	৴০	০
শ্রীঅরুণাচল পঞ্চস্তোত্র	০	।০	০
মরাঠী			
শ্রীরমণ প্রস্থানত্রয়ী	১	।০	০
বাঙ্গালা			
উপদেশ সার	০	৴০	০
ভগবান শ্রীরমণমহর্ষি	০	।০	০
আমি কে ?	০	।০	০

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীনিরঞ্জনানন্দ স্বামী, সত্ত্বাধিকারী।
শ্রীরমণাশ্রম তিরুবরণামালৈ, দক্ষিণ ভারত।